لَيْسَ مِنْ مَنْهَجِ السَّلَفِ – গ্রন্থের সরল অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

মূল

শাইখ ড. মুহাম্মাদ ইবন উমার ইবন সালিম বাযমূল

অনুবাদ-সম্পাদনা ও ব্যাখ্যা

শাইখ ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

Believers Vision
believersvision.com

لَيْسَ مِنْ مَنْهَجِ السَّلَفِ – গ্রন্থের সরল অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

মূল

শাইখ ড. মুহাম্মাদ ইবন উমার ইবন সালিম বাযমূল

অনুবাদক

হাবিব বিন তোফাজ্জল

অনুবাদ-সম্পাদনা ও ব্যাখ্যা

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

আল-ফিকহ অ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

Believers Vision

বিলিভার্স ভিশন পাবলিকেশন্স

২১, নুরুল হক টাওয়ার (৩য় তলা), পাটুয়াটুলী, ঢাকা।
অভিযোগ ও পরামর্শ : ০১৩২২ ৩৫২১০১

www.believersvision.com
info@believersvision.com
fb.com/BelieversVision

এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

ISBN : 978-984-35-1396-0

প্রকাশকাল :
নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ | রবিউল আউয়াল, ১৪৪৩ হিজরি
প্রুফ, প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠাসজ্জা : বিলিভার্স ভিশন টিম

পরিবেশক : আত-তাওফীক প্রকাশন
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদ্রাসা মার্কেট নিচতলা, বাংলাবাজার, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭৩৮-১৬২২৯৬, ০১৯১৬৫২৪২৪১

অনলাইন পরিবেশক :
রকমারি, ওয়াফি লাইফ, ইখলাস স্টোর, আলোকিত বই বিতান

মূল্য : ৩৬৮ ৳

প্রকাশকের কথা

ঈদ উপলক্ষে আমরা হাদিয়া বা সালামি পাই। ১৪৪২ হিজরি তথা ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ঈদুল ফিতরে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে সেরা হাদিয়াটি পেয়েছিলাম। সেদিন প্রকাশনীর অন্যতম সেরা বই 'এটা সালাফগণের মানহাজ নয়'-এর অনূদিত পাণ্ডুলিপি হাতে পাই। ভালোবাসার দীনি ভাই, অনুবাদক হাবিব বিন তোফাজ্জল ঈদের দিনই আমাকে এই অসামান্য উপহারটি দেন। তিনি ইংরেজি থেকে গ্রন্থটি সরল বাংলায় রূপান্তর করেন এরপর প্রাথমিকভাবে আমি অনুবাদটি সম্পাদনা করি। এরপর চিন্তায় পরে যাই মূল আরবি গ্রন্থ থেকে অনুবাদ সম্পাদনা কাকে দিয়ে করানো যায়। কারণ তখনও আমাদের কোনো বই-ই প্রকাশ পায়নি এবং আমাদের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানটির সাথে ভালো শাইখদেরও কোনো পরিচিতি নেই। শ্রদ্ধেয় উস্তাজ ও বড়ো ভাই আবূ হাযম হাফিযাহুল্লাহ কয়েকজন আলিমের কথা পরামর্শ দেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ ছিলেন বর্তমান সময়ের বিশুদ্ধ আকীদা-মানহাজের অন্যতম প্রচারক, সম্মুখযুদ্ধের বীরপুরুষ শাইখ প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া হাফিযাহুল্লাহ। আল্লাহ তাআলা তাঁকে নেক হায়াত দান করুন। শাইখ সম্পর্কে উপযুক্ত প্রশংসা করার ভাষা অধমের জানা নেই। তো আমরা কয়েকজন ভাইয়ের কাছে আমাদের মনোবাসনা উপস্থাপন করি। কারণ আমাদের নিজেদের সাহস হচ্ছিল না। এমনকী কল্পনাতেও শঙ্কা ছিল যে, একটু বেশিই উচ্চাশা লালন করছি বোধহয়। কিন্তু মহান আল্লাহর ফয়সালা রদ করার কেউ নেই। শ্রদ্ধেয় দীনি ভাই মুহাম্মাদ সুমন খানের মাধ্যমে আমরা সেই স্বপ্নপূরণের ডাক শুনতে পাই। শাইখ হাফিযাহুল্লাহ আমাদের অনূদিত পাণ্ডুলিপিটি সম্পাদনা ও ব্যাখ্যা সংযোজন করে দিতে রাজি হন। আলহামদুলিল্লাহ।

শাইখ ড. মুহাম্মাদ বিন উমার বাযমূল হাফিযাহুল্লাহর এই অসাধারণ বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। জানামতে বাংলা ভাষায় শাইখের এটিই প্রথম অনূদিত বই এবং এ বইয়ের মাধ্যমেই শাইখের সাথে আমাদের বাংলাভাষী পাঠক সমাজ পরিচিত হবেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম। বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। আল্লাহ তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন।

বইটির গুরুত্ব বোঝানো বা শারঈ মূল্যায়ন করার যোগ্যতা আমাদের নেই। সেজন্য সম্মানিত পাঠককে 'সম্পাদক ও ব্যাখ্যাকার'-এর ভূমিকা এবং মূল বইটি পরেই উপলব্ধি করতে হবে। সাধ্যমতো চেষ্টার পরও কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। বিজ্ঞ পাঠক সেরকম কিছু পেলে আমাদেরকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

'আল-গাফফার'-এর ক্ষমার ভিখারি

— মুহাম্মাদ মাহিন আলম
প্রকাশক
বিলিভার্স ভিশন

০২ মুহাররাম ১৪৪৩ হিজরি
০৮ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর। যিনি আমাদের তাওহীদ ও শির্কের পার্থক্যজ্ঞান দিয়েছেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর।

আলহামদুলিল্লাহ, ভারতীয় উপমহাদেশে সালাফি/আহলেহাদীস আলিমদের দাওয়াতের মেহনতে প্রচুর পরিমাণে মানুষ নিজেদের আকীদাহকে বিশুদ্ধ করতে পেরেছে। কিন্তু, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে এই যে, আমাদের দীনের পথে আসা অধিকাংশ ভাই ও বোনেরাই সঠিক মানহাজের ব্যাপারে অজ্ঞ। অথচ মানহাজই আকীদাহর উপর প্রভাব ফেলে।

অনেকেই শুধু স্বীকার করে কুরআন ও হাদীস মানতে হবে এবং তাদের একটাই ধারণা সেটা হচ্ছে, কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু, এর সঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উসূল হচ্ছে, সালাফদের মানহাজ অনুযায়ী কুরআন-হাদীস বোঝা; তা তাদের জানা থাকে না।

এজন্য যারা মানহাজ সম্পর্কে জানে না, তারা সবার পেছনেই দৌড়াতে থাকে। যে-ই কুরআন ও হাদীসের নাম নেয় এরা তাদের কথাই মেনে নেয়, যদিও তারা কুরআন ও হাদীসকে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করে।

আপনারা এ ব্যাপারে অবগত আছেন যে, কুরআন ও হাদীসের সঠিক ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যা উভয়ই করা যায়। কুরআন ও হাদীসের ভ্রান্ত ব্যাখ্যার কারণেই আজ এতগুলো ফির্কার সৃষ্টি হয়েছে। কোনো ফির্কাই কিন্তু বলে না কুরআন ও হাদীসকে ছেড়ে দাও। আসল কথা হচ্ছে, সালাফে সালেহীনদের মানহাজ ব্যতীত কেউ-ই সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর অটল থাকতে পারে না।

একদল মানুষ আছে, যারা কুরআন ও হাদীসকে অনুসরণ করার পূর্ণ ইচ্ছে অন্তরে পোষণ করে কিন্তু কুরআন ও হাদীসকে বোঝার জন্য তাদের কাছে সঠিক উসূল নেই বা সঠিক মানহাজ জানা নেই। এই বইটির মাধ্যমে সে সকল পাঠকবৃন্দ সঠিক ও ভুল মানহাজের কিছুটা হলেও পার্থক্যজ্ঞান অর্জন করতে পারবেন। ইনশাআল্লাহ।

অবশেষে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি শ্রদ্ধেয় ভাই মাহিন আলমের প্রতি। কেননা, তিনিই এই গুরুত্বপূর্ণ বইটি অনুবাদের দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করে আমাকে কিছুটা নেকি হাসিল করার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছি তিনি যেন আমাকে এবং ভাইকে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম প্রতিদান দান করেন।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার অত্যধিক প্রিয় শাইখ, ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া স্যারের প্রতি। অধমের অনুবাদকর্মটি তিনি সম্পাদনা ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা যুক্ত করে এই বইটিকে পূর্নতা দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা এই বইটিকে যেন শাইখ ও আমাদের জন্য জান্নাতের উসীলা করে দেন। আমীন।

বিনীত

— হাবিব বিন তোফাজ্জল।

১৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রি.

সম্পাদক ও ব্যাখ্যাকারের ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আপনার জন্য যত হামদ, ভালোবাসা ও সম্মানপূর্ণ প্রশংসা, যা কেবল আপনারই অধিকার। আপনি দয়া করে আমাকে আপনার সঠিক পথের পথিক বানিয়েছেন, আপনার নবির অনুসারী বানিয়েছেন, আপনার জান্নাতী বান্দা সাহাবায়ে কিরামের পদাঙ্কে চলার তাওফীক দিয়েছেন। আপনি যাকে ইচ্ছা আপনার দয়ায় হিদায়াতের পথে রাখেন, যাকে ইচ্ছা আপনার ইনসাফের দাবি অনুযায়ী পথভ্রষ্ট করেন। আপনি আপনার কাছে আপনার যাবতীয় নাম ও গুণের উসীলায় দুআ করছি আপনি আমাকে আপনার সিরাতে মুস্তাকীমে সর্বদা দৃঢ়পদ রাখুন, আমীন।

অতঃপর, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর একটি হাদীসের দিকে চিন্তা নিবদ্ধ করলেই মানহাজের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'অবশ্যই আমার উম্মাতের ওপর তাই আপতিত হবে যা বনী ইসরাঈলের ওপর আপতিত হচ্ছে, একেবারে জুতায় জুতায়, এমনকী যদি তাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্যে তার মায়ের ওপর উপগত হয়, আমার উম্মাতের মধ্যেও কেউ হবে যে এমনটি করবে। আর বনী ইসরাঈল ৭২ মিল্লাতে বিভক্ত হয়েছে, আমার উম্মাত ৭৩ মিল্লাতে বিভক্ত হয়ে যাবে, তাদের সবগুলোই জাহান্নামে যাবে, কেবল একটি মিল্লাত ছাড়া। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, সে একটি মিল্লাত কারা? তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'যার ওপর আমি আছি ও আমার সাহাবিরা আছে'। *[তিরমিযি, আল-জামি'উ, হাদীস নং ২৬৪১; হাকিম, মুসতাদরাক, হাদীস নং ৪৪৪]* অপর বর্ণনায় এসেছে, 'যার ওপর আজকে আমি ও আমার সাহাবিরা রয়েছে'। *[মারওয়াযি, আস-সুন্নাহ, হাদীস নং ৫৯]* অপর বর্ণনায় এসেছে, সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে নাজাতপ্রাপ্ত

গোষ্ঠী কারা?' রাসূল বললেন, যারা ওপর আমি আছি ও আমার সাহাবিরা আছে'। *[আজুররি, আশ-শরীআহ, ১/৩০২]* অপর বর্ণনায় এসেছে, তারাই হচ্ছে আল-জামাআহ। *[আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৫৯৭; আহমাদ, মুসনাদ ১৬৯৩৭]* এসব বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, উম্মাতের মধ্যে মতভেদ হবেই, আর এ মতভেদের পরিণতি হিসাবে যখন সেটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবায়ে কিরামের প্রদর্শিত মানহাজ তথা মত ও পথের বিপরীতে চলে যায়, তখন প্রথমে কিছু ভুলে নিপতিত হয়, তারাই পরবর্তীতে কোনোভাবে ফির্কায় পরিণত হয়, ধীরে ধীরে আলাদা মিল্লাতে রূপান্তরিত হয়। হ্যাঁ, এখানে সবাই সমান পর্যায়ের থাকে না। তাদের কোনো কোনো ফির্কা সালাফদের বিশুদ্ধ মানহাজ থেকে দূরে যেতে যেতে একেবারে দীন থেকে বেরিয়ে গিয়ে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয়ে যায়; যেমন, ৭৩ ফির্কার বাইরের ফির্কাসমূহ, যারা ইসলাম বা মুসলিম হিসাবে পরিচয় দিলেও বাস্তবে তারা কাফির; যেমন, কাদিয়ানী, দ্রুজ, নুসাইরি (তথাকথিত আলাওয়ি), বাবিয়্যাহ, বাহায়িয়্যাহ, ইসমাঈলিয়্যাহ, আগাখানিয়্যাহ, বুহরাহ, দাউদিয়্যাহ, সুলাইমানিয়্যাহ প্রভৃতি ফির্কাসমূহ।

আবার কোনো কোনো ফির্কা পুরোপুরি বের না হলেও তাদের এমন সব আকীদা-বিশ্বাস রয়েছে যা সামষ্টিকভাবে সকলে বিশ্বাস করে না, কিন্তু যদি একক বা তাদের কোনো গোষ্ঠী এসব শির্কী ও কুফরি আকীদা বিশ্বাস ধারণ করে তবে তারাও পর্যায়ক্রমে (তাকফীর-এর শর্তপূরণ ও বাধা দূরীকরণ সাপেক্ষে) কাফির এবং দীন থেকে বের হয়ে যায়। যেমন শীয়া, রাফিযি, মুতাযিলা, মুরজিয়া, জাহমিয়া, খারিজী ইত্যাদি সম্প্রদায়। এদের মধ্যে কেউ কেউ বাহাত্তর ফির্কার বাইরেও চলে যায়, আবার কেউ কেউ বাহাত্তর ফির্কার ভিতরে থাকে। এরা সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্ত। তারা নিজেরাও নিজেদেরকে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী দাবি করে না। সুতরাং আহলুস সুন্নাহ (রাসূলের আদর্শের অনুসারী) ওয়াল জামাআত (সাহাবায়ে কিরাম) এর সাথে তাদের সম্পর্ক তারা নিজেরাই কর্তন করেছে। তাই যে বা যারা তাদের ব্যাপারে চুপ থাকবে তারা হয় অজ্ঞ, না হয় দীনের সাথে খিয়ানতকারী হিসাবে বিবেচিত। তাদের সাথে কোনো প্রকার ঈমানী আচরণ করা যাবে না।

এর বাইরে যাদের আকীদা-বিশ্বাস ও মানহাজে সমস্যা দেখা দেয়, প্রথমে হয়ত সামান্য কিছু ভুল হতে থাকে, ধীরে ধীরে সেটা তাদের অনুসারীদের নিকট বাড়তে বাড়তে ফির্কার রূপ পরিগ্রহণ করে। যেমন আশআরি ও মাতুরিদি ইত্যাদি ফির্কাসমূহ। এসব সম্প্রদায় যে পথভ্রষ্ট ও তারা যে বাহাত্তর ফির্কার অন্তর্ভুক্ত সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকা কোনোভাবেই সমীচীন নয়। তাদের সাথে আচরণ হবে দাওয়াতের, দাওয়াতের নীতি অনুযায়ী তাদের সাথে ঈমানী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে।

তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কিরাম হচ্ছেন মানহাজের মানদণ্ড; মানহাজের বিপত্তি মানেই সকল অপকর্মের সূচনা, একথা খাঁটি সত্য। তাই মানহাজের বিপত্তিকে কোনোভাবেই গৌণ করে দেখা যাবে না। যারা আকীদা ও মানহাজের বিপত্তিসহ ঐক্যের স্বপ্ন দেখে তারা আর যাই হোক আলিম বিবেচিত হতে পারে না। যদি তা-ই হতো তবে ইমামগণের সকল ইলমী জিহাদকে অপমান করা হবে। দীনকে মানুষের মতামত ও খেল-তামাশায় রূপান্তরিত করা হবে। সেজন্য আমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে সহীহ আকীদা কী? বিশুদ্ধ মানহাজ কী?

এ গ্রন্থে বেশ কিছু বিশুদ্ধ আকীদা ও মানহাজের নীতি তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থটি যদিও কলেবরে ছোটো কিন্তু উপকারিতার দিক থেকে এ পথের পাঞ্জেরী হিসাবে কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস রয়েছে। আমি আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে মানহাজের ওপর পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনায় তা কাজে লাগবে। যুবকদের জন্য এটি সঠিক পথের মাইলফলক হিসাবে কাজ করবে।

আল্লাহ আমাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমাদেরকে আকীদা ও মানহাজের ওপর অটল থেকে দীনের খিদমাত করার তৌফিক দিন। বাংলা ভাষাভাষী মানুষগুলোকে এ কিতাবের মাধ্যমে বিশুদ্ধ আকীদা ও মানহাজের পথে পরিচালিত করুন। আমীন, সুম্মা আমীন।

— প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

আল-ফিকহ অ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

শাইখ ড. মুহাম্মাদ ইবন উমার ইবন সালিম বাযমূল (হাফিযাহুল্লাহ)র

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

❀ পরিচিতি:

শাইখ ডক্টর মুহাম্মাদ ইবন উমার ইবন সালিম আল-বাযমূল হাফিযাহুল্লাহর জন্ম সৌদি আরবের মক্কা নগরীতে। তিনি ১৪১৪ হিজরিতে মক্কার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'উলূমুল কুরআন' ও 'উলূমুল হাদীস' এর ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাকাল্টি হিসেবে কর্মরত আছেন এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কুরআন-সুন্নাহ বিভাগে, দাওয়াহ ও উসূল-উদ-দীন বিষয়ে দারস দিচ্ছেন। তিনি উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্টিফিক রিসার্চ অ্যান্ড হেরিটেজ রিভাইভাল সেন্টারের ডিরেক্টর হিসেবেও কাজ করছেন। তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্বনামধন্য অধ্যাপকদের মাঝে অন্যতম।

ইতঃপূর্বে তিনি মক্কার আল-আজিজিয়ার ইবন বায রাহিমাহুল্লাহর মসজিদে ইমাম আজুররির কিতাব 'আশ-শরীআহ' পড়াতেন। শাইখ রাবি হাফিযাহুল্লাহর অসুস্থতার কারণে তিনি মসজিদে 'ফাতহুল মাজীদ' পড়াতে পারেননি এবং তার পরিবর্তে তিনি শাইখ মুহাম্মাদ বাযমূলকে দায়িত্ব প্রদানের প্রস্তাবও দিয়েছিলেন।

শাইখ 'উলূমুল কুরআন'-এর ওপর গভীর জ্ঞানের জন্য অত্যন্ত সুপরিচিত। তার লিখন এবং দারস স্পষ্ট এটাই প্রমাণ করে। এছাড়াও তিনি উলূমুল হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, উসূলুল ফিকহ বিষয়েও গভীর জ্ঞান রাখেন।

❀ তার আকীদাহঃ

শাইখ সালাফগণের আকীদাহ-ই পোষণ করেন, তিনি আল্লাহর সকল নাম ও গুণাবলি যেভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে সেভাবেই বিশ্বাস করেন। তিনি জাহমিয়্যাহ, কাদরিয়া, খারিজী, মুর্জিয়া, বিদআতি ও বর্তমান ইখওয়ানি এবং তাবলীগ গোষ্ঠীদের ভুলভ্রান্তি নিরসন করেন এবং তাদের ভুলভ্রান্তি স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন।

❀ তার শিক্ষকমণ্ডলীঃ

শাইখ বাযমূলের শিক্ষকদের মাঝে অন্যতম কয়েকজন হচ্ছেন: শাইখ সালিহ আল ফাওযান, শাইখ রাবি ইবন হাদি, শাইখ ইয়াহিয়া আল-মুদারিস, শাইখ আবদুল-ওয়াকিল আল-হাশিমি। এছাড়াও শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানি রাহিমাহুল্লাহর সাথে ফোনে তার সুসম্পর্ক ছিল। (আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন)

আল্লাহ তাআলা শাইখকে নেক হায়াত দান করুন। তাঁর ইলমী খিদমাতসমূহ দ্বারা আমাদেরকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দিন। আমীন।

বিষয়ভিত্তিক সূচি

১.

এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

“

এটা সালাফ[১] গণের মানহাজ[২] নয় যে, সুন্নাহ[৩]র ক্ষেত্রে কারো অবস্থার খোঁজখবর নেওয়া ব্যতীত তার কাছ থেকে ইলম[৪] গ্রহণ করা। যেহেতু বলা হয়েছে: প্রকৃতপক্ষে এই ইলমই দীন, সুতরাং আপনি তার দিকে দৃষ্টি রাখুন যার থেকে আপনি দীন গ্রহণ করছেন[৫]।[৬]

”

টীকা-১

❑ **সালাফ পরিচিতি :** সালাফ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, পূর্বে গত হওয়া। সেটা দুভাবে হতে পারে,

১) পূর্বের ব্যক্তি বা গোষ্ঠী। যেমন:

> আল্লাহ বলেন, "ফলে পরবর্তীদের জন্য আমরা তাদেরকে অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত করে রাখলাম।" *[সূরা আয-যুখরুফ: ৫৬]*

২) পূর্বের কোনো কাজ বা আদর্শ। যেমন:

> আল্লাহ বলেন, "যারা সুদ খায় তারা তার ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এটা এ জন্য যে, তারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয় তো সুদেরই মতো'। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। অতএব, যার নিকট তার রব-এর পক্ষ হতে উপদেশ আসার পর সে বিরত হলো, তাহলে অতীতে যা হয়েছে তা তারই এবং তার ব্যাপার আল্লাহর ইখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।" *[সূরা আল-বাকারাহ: ২৭৫]*

> অনুরূপ "নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাদেরকে বিয়ে করেছে, তোমরা তাদেরকে বিয়ে করো না; তবে পূর্বে যা সংঘটিত হয়েছে (সেটা ক্ষমা করা হলো) নিশ্চয় তা ছিল অশ্লীল, মারাত্মক ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট পন্থা।" *[সূরা আন-নিসা: ২২] অনুরূপ- সূরা আন-নিসা: ২৩; আল-মায়িদাহ: ৯৫; আল-আনফাল: ৩৮; সূরা ইউনুস: ৩০; আল-হাক্কাহ: ২৪।*

৩) পরিভাষায় একজন মানুষের সালাফ হচ্ছে, তার পূর্বে তার পিতৃপুরুষ বা নিকটাত্মীয়দের যারা মারা গেছে। তারা আবার ভালো কিংবা মন্দ উভয় হিসেবেই সালাফ হতে পারে। কিন্তু সাধারণত খারাপ কাজের ব্যাপারে পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করলে মানুষ সেটাকে ভালোভাবে গ্রহণ করে না। সেটা মূল্যায়নযোগ্য হয় না। সেটার অনুসরণ করতেও বলা

হয় না। তাই আমাদের এখানে উদ্দেশ্য কেবল 'সালাফে সালিহীন' বা সৎ ব্যক্তিবর্গ যারা আমাদের আগে গত হয়েছেন। এমতাবস্থায় সালাফে সালিহীনের সংজ্ঞা কী এ ব্যাপারে আলিমগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে:

১. সালাফে সালিহীন কেবল সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

২. সালাফে সালিহীন কেবল সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের সুন্দর অনুসারী তাবিয়িগণ।

৩. তারা সাহাবা, তাবিয়ি ও তাবিয়িগণের অনুসারীরা।

৪. তারা তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত আলিমগণ।

৫. তারা পঞ্চম শতাব্দীর আগ পর্যন্ত। বস্তুত সময় দিয়ে নির্ধারণ করা সঠিক হবে না। কারণ বড়ো বড়ো ফিরকাগুলো সাহাবায়ে কিরামের পরপরই বের হয়ে পড়েছিল। *[ড. মুহাম্মাদ বা কারীম বা আবদুল্লাহ, ওয়াসাত্বিয়্যাতু আহলিস সুন্নাতি বাইনাল ফিরাক্বি ৯৬-১০১]*

তাহলে সালাফ হচ্ছেন সাহাবায়ে কিরাম, আর যারা সাহাবায়ে কিরামের সুন্দর অনুসরণ করেছেন সেসব নির্ধারিত তাবিয়ি ও নির্ধারিত আতবাউত তাবিয়ি, দীনের বিখ্যাত ইমামগণ, যাদের ইমামত ব্যাপারে সকলেই সাক্ষ্য প্রদান করে।' *[সাফারীনী, লাওয়ামিউল আনওয়ার আল-বাহিয়্যাহ (১/২০)]* এতে করে সেসব লোক 'সালাফ'-এর সংজ্ঞা থেকে বেরিয়ে যাবে যারা সাহাবায়ে কিরামের পরে এসেছেন কিন্তু তারা বিদআতে যুক্ত হয়েছেন, খারিজি, রাফিদি, কাদারিয়া, মুরজিয়া, জাবরিয়্যাহ, জাহমিয়্যাহ, মুতাযিলাহ, কাররামিয়্যাহ ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। সুতরাং সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের সুন্দর অনুসারীরাই সালাফি; কারণ—

১. আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তার দিকে যারা প্রত্যাবর্তন করে তাদের পথে চলতে নির্দেশ দিয়েছেন।

> আল্লাহ বলেন, "আর তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সঙ্গে শির্ক করার জন্য পীড়াপীড়ি করে, যে বিষয়ে তোমার কোনো

> জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মেনো না এবং দুনিয়াতে তাদের সঙ্গে বসবাস করবে সদ্ভাবে আর যে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অনুসরণ করো। তারপর তোমাদের ফিরে আসা আমারই কাছে, তখন তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করব।" *[সূরা লুকমান: ১৫]*

ইমাম ইবনুল কাইয়িম বলেন, "প্রত্যেক সাহাবি আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী; সুতরাং তাদের পথ, কথা, আকীদাহ-বিশ্বাস অনুসরণ করা ফরয।" *[ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন (৪/১২০)]*

২. অনুরূপ আল্লাহ তাআলা বলেন,

> "আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা ইহসানের সঙ্গে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তিনি তাদের জন্য তৈরি করেছেন জান্নাত, যার নিচে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এ তো মহাসাফল্য।" *[সূরা আত-তাওবাহ: ১০০]*

এখানেও আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর সন্তুষ্টি জ্ঞাপন করেছেন যারা সাহাবায়ে কিরাম (মুহাজির ও আনসার)দের সুন্দর অনুসরণ করবে। সুতরাং সালাফি মানহাজের অনুসারী হওয়া ব্যতীত অন্য কিছু হওয়ার সুযোগ কোথায়? আহলুস সুন্নাহ যদি নিজেদের সালাফি নাম প্রদান করে তাতেও সমস্যা নেই; কারণ এটি তাদের বৈশিষ্ট্যগত একটি নাম। তাদেরকে যেভাবে সুন্নি বলা হয়, তেমনি তাদেরকে সালাফি বলার মধ্যেও কোনো সমস্যা নেই। *[আর-রুহাইলি, মাওকিফু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআতি মিন আহলিল আহওয়ায়ি ওয়াল বিদআ (১/৬৩)]*

সুতরাং বিভিন্ন ফিরকার উদ্ভব হওয়ার পরে যারা নিজেদের আকীদাহ ও মানহাজকে সাহাবায়ে কিরামের আকীদাহ ও মানহাজের ওপর বিশুদ্ধ করতে চেয়েছে তারাই সালাফ, তাদের দিকে সম্পৃক্ত করে নিজেদের মানহাজকে 'সালাফি মানহাজ' বলার মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই।

৩. এ সালাফ ও সালাফি মানহাজের পরিচিতি প্রদানের মাধ্যমে সালাফগণের আদর্শ প্রকাশিত হবে, বিদআতিদের ব্যাপারে তাদের অবস্থান স্পষ্ট হবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

“তোমরা আমার আদর্শকে আকঁড়ে ধর, খুলাফায়ে রাশিদার আদর্শকে আঁকড়ে ধর, গোড়ালির দাঁত দিয়ে তা কামড়ে থাক, নব উত্থিত বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাক; কারণ প্রতিটি নব উত্থিত বিষয়ই বিদআত, আর প্রতিটি বিদআতই পথভ্রষ্টতা।” *[আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ১৭১৪৪; আবু দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং ৪৬০৭; ইবন মাজাহ, আস-সুনান, হাদীস নং ৪২]*

৪. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নাজাতপ্রাপ্ত ফিরকার (যারা জাহান্নামে যাবে না সেসবের) পরিচয় দেওয়ার সময় বলেছেন,

“তারা হবে সেসব লোক যারা আমি যার ওপর আছি আর আমার সাহাবিগণ যার ওপর আছে।” *[তিরমিযি, আল-জামিউ, হাদীস নং ২৬৪১; হাসান সনদে]*

৫. ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অনুকরণ করতে চাও, তাহলে সে যেন যারা মারা গেছে তাদের অনুকরণ করে, আর তারা তো হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহাবিগণ, যারা এ উম্মাতের সবচেয়ে উত্তম লোক; অন্তরের দিক থেকে নেককার, ইলমের দিক থেকে গভীর, কৃত্রিমতা প্রকাশে সবচেয়ে কম। তারা এমন এক জাতি, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবির সাথিত্বের জন্য, দীনকে অন্যদের কাছে বহন করার জন্য চয়ন করেছেন। সুতরাং তোমরা তাদের চরিত্রের সঙ্গে ও তাদের পথে বিচরণ করার মাধ্যমে তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করো; কারণ তারা সকলেই ছিল সরল-সঠিক পথের ওপর।” *[বাগাওয়ি, শারহুস সুন্নাহ (১/২১৪)]*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> "তোমরা আমার আদর্শকে আকঁড়ে ধর, খুলাফায়ে রাশিদার আদর্শকে আঁকড়ে ধর, মাড়ির দাঁত দিয়ে তা কামড়ে থাক, নব উত্থিত বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাক; কারণ প্রতিটি নব উত্থিত বিষয়ই বিদআত, আর প্রতিটি বিদআতই পথভ্রষ্টতা।" *[আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা. ১৭১৪৪; আবু দাউদ, আস-সুনান, হা. ৪৬০৭; ইবন মাজাহ, আস-সুনান, হা. ৪২]*

৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজাতপ্রাপ্ত ফিরকার (যারা জাহান্নামে যাবে না সেসবের) পরিচয় দেওয়ার সময় বলেছেন,

> "তারা হবে সেসব লোক যারা আমি যার ওপর আছি আর আমার সাহাবিগণ যার ওপর আছে।" *[তিরমিযি, আল-জামিউ, হা. ২৬৪১; হাসান সনদে]*

৫. ইবন মাসউদ ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অনুকরণ করতে চাও, তাহলে সে যেন যারা মারা গেছে তাদের অনুকরণ করে, আর তারা তো হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবিগণ, যারা এ উম্মাতের সবচেয়ে উত্তম লোক; অন্তরের দিক থেকে নেককার, ইলমের দিক থেকে গভীর, কৃত্রিমতা প্রকাশে সবচেয়ে কম। তারা এমন এক জাতি, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবির সাথিত্বের জন্য, দীনকে অন্যদের কাছে বহন করার জন্য চয়ন করেছেন। সুতরাং তোমরা তাদের চরিত্রের সঙ্গে ও তাদের পথে বিচরণ করার মাধ্যমে তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করো; কারণ তারা সকলেই ছিলেন সরল-সঠিক পথের ওপর।" *[বাগাওয়ি, শারহুস সুন্নাহ (১/২১৪)]*

৬. ইমাম আহমাদ ﷺ বলেন, "আমাদের কাছে আকীদাহ ও সুন্নাতের মূলনীতি হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবিগণ যে পথের ওপর ছিল তা আঁকড়ে থাকা, তাদের অনুসরণ-অনুকরণ করা ও বিদআত পরিত্যাগ করা।" *[লালেকাঈ, শারহু উসূলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ (১/১৫৬)]*

টীকা-২

❑ **মানহাজ পরিচিতি:** মানহাজ শব্দের অর্থ চলার স্পষ্ট পথ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> "আর আমরা তাদের সবার জন্যই নির্দিষ্ট করে দিয়েছি শরীআত ও মিনহাজ- স্পষ্টভাবে চলার পথ।" *[সূরা আল-মায়িদাহ: ৪৮]*

সাধারণত স্পষ্ট পথকেই মানহাজ বলা হয়। *[ইবন মানযূর, লিসানুল আরব]*

❑ **মানহাজ ও আকীদাহ'র মধ্যে পার্থক্য:**

শাইখ সালিহ আল-ফাওযান ﷺ বলেন, মানহাজ শব্দটি আকীদাহ'র চেয়েও ব্যাপক। কারণ মানহাজ আকীদাহ, সুলুক, আখলাক, লেনদেন এবং মুসলিমদের জীবনের প্রতিটি অংশকেই শামিল করে। মুসলিম যেসব পথে চলে সেটাই মানহাজ। কিন্তু আকীদাহ, তা দিয়ে বোঝা যায় ঈমান ও শাহাদাতাইনের অর্থ ও চাহিদাসমূহ। এ হচ্ছে আকীদাহ'র মূল অংশ। *[আল-আজওয়িবাতুল মুফীদাহ, পৃ. ৭৫]*

ঈমান আনার পরে মানহাজের গুরুত্ব বোঝা যায় সাহাবায়ে কিরামের পদাঙ্ক অনুসরণের গুরুত্বের মাঝেই।

শুধু আকীদাহ-বিশ্বাসের কথা বললে অনেকে বলতে পারে যে, আমার আকীদাহ তো আমার অন্তরে। তাই সেটার বাস্তবায়ন কীভাবে হচ্ছে, আকীদাহ অনুযায়ী তার জীবনের সবকিছু সঠিকভাবে চলছে কি না? জীবনের সার্বিক অবস্থা ও অবস্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কিরামের চলার নীতি বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না, সেটাই দেখাবে মানহাজ। এজন্য সালাফে সালিহীনের দূরদর্শিতা প্রকাশ পায় যখন তারা আকীদাহ'র কিতাবকে 'সুন্নাহ' নামকরণ করতেন। কারণ এর মাধ্যমে তারা আকীদাহ ও মানহাজ উভয়টিই আলোচনা করতেন।

এজন্য ইবন তাইমিয়্যাহ ﷺ মানহাজের সংজ্ঞায় বলেন, "সে সুন্দর পদ্ধতি যা অনুসরণ করলে আকীদাহ, আমল ও ইবাদাতের মাসআলাসমূহে সঠিক ও বিশুদ্ধ পন্থা নিশ্চিত হয়।"

মানহাজ এর সমার্থবোধক শব্দ হচ্ছে, মানাযিল, মাদারিজ, কাওয়ায়িদ ওয়াল উসূল ইত্যাদি।

সালাফের মানহাজ গ্রহণ করা ফরযে আইন। কারো জন্যই নিজের মনোমতো পথ ও পন্থা গ্রহণ করা ইসলাম অনুমোদন করে না।

» যারা সালাফগণের মানহাজে চলেন তাদের বলা হয়,

১) সাহায্যপ্রাপ্ত গোষ্ঠী।

২) নাজাতপ্রাপ্ত গোষ্ঠী।

৩) কিয়ামতের আগ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকা একটি সম্প্রদায়।

৪) আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত।

৫) আহলুল হাদীস বা আসহাবুল হাদীস।

৬) আসহাবুল আসার।

এসব নামে যারা পরিচিত তারা সবাই এ মানহাজের চলার কারণে এসব নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

❑ সালাফগণের মানহাজের মূলকথা:

১) দীন দুটি বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত:

এক. আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদাত করা যাবে না।

দুই. আল্লাহ যা শরীআত হিসেবে দিয়েছেন তার বাইরে অন্য কোনো পদ্ধতিতে ইবাদাত করা যাবে না।

২) তারা কেবল সেসব মাসআলাতেই কথা বলেন, যাতে তাদের সালাফগণের (পূর্বসূরিদের) পদাঙ্ক রয়েছে।

৩) শাসকশ্রেণির হক কথা শোনা ও মানা, আর তা মান্য করার ব্যাপারে হক পদ্ধতি অবলম্বন করা।

৪) নিজেকে এবং অপরকে পরিশুদ্ধ করা।

❑ সালাফগণের মানহাজের পূর্ণ রূপরেখা:

সালাফগণ আকীদাহ, দাওয়াত, সুলুক, শাসন-রাজনীতি, জ্ঞান অর্জন, ফিকহ-তশরী ও ভিন্নমতের সঙ্গে আচরণ করার এক অনন্য মানহাজের অধিকারী ছিলেন। এ গ্রন্থে সেসব মানহাজের অনেক কিছুই আলোচিত হবে, তাই সেগুলো এখানে আর আলোচনা করার প্রয়োজন নেই।

টীকা-৩

সুন্নাহ শব্দটি এখানে পরবর্তীকালের ব্যবহৃত ফিকহি 'সুন্নাহ' নয়। আমরা জানি যে, পূর্ববর্তী সালাফগণ আকীদাহ ও মানহাজের বইয়ের নাম রাখতেন 'সুন্নাহ' হিসেবে। সুতরাং যাদের আকীদাহ ও মানহাজের ব্যাপারে স্পষ্টতা নেই তাদের কাছ থেকে ইলম নেওয়া যাবে না। আপনি তাদের কাছ থেকে নবুওয়াতি ইলমের ওয়ারিশ হতে পারবেন না।

টীকা-৪

অর্থাৎ নবুওয়াতের মাধ্যমে প্রাপ্ত ইলম। কুরআনের ইলম, হাদীসের ইলম। এটাই হচ্ছে দীন।

টীকা-৫

অর্থাৎ সে কি এ দীনের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করছে, না কি করছে না। কোনো মানুষের জন্যই উচিত হবে না খারিজি, মুরজিয়া, রাফিদি, মুতাযিলি, কাদারি, জাবরী, জাহমি ইত্যাদি থেকে ইলম অর্জন করা।

টীকা-৬

এটি ইমাম ইবন সীরীনের বক্তব্য, যা ইমাম মুসলিম তার 'সহীহ' গ্রন্থের ভূমিকায় নিয়ে এসেছেন। মুসলিম, আস-সহীহ (১/১৪); ইবন আবি শাইবাহ, আল-মুসান্নাফ, হা. ২৬৬৩৬; দারিমি, আস-সুনান, হা. ৪৩৮; আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া (২/২৭৮); বাইহাকি, মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার (১/১৩৮), নং ১৫৩; তাছাড়া তা ইমাম মালিক ইবন আনাস ﷺ থেকেও বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, মুওয়াত্তা মালিক (১/২৫); তাহকীক: আল-আযমি। আর আমালি ইবন সামঊন-এর

বর্ণনায় তা ইবরাহীম আন-নাখয়ি ؒ থেকে এসেছে। খতীব বাগদাদি তা কয়েকজন থেকে নিয়ে এসেছেন, আলি ইবন আবি তালিব, দাহহাক ইবন মুযাহিম, মুহাম্মাদ ইবন সীরীন প্রমুখ। তাছাড়া তিনি এটাকে ইবন উমার ؓ'র মাধ্যমে মারফু সূত্রেও এনেছেন। তবে মারফু সূত্র বিশুদ্ধ নয়। অনুরূপভাবে আবু নুআইম, *হিলইয়া (২/২৭৮)* ও কাযি ইয়াদ, *আল-ইলমা, পৃ. ৫৯,* আবু হুরায়রা ও আনাস ؓ থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন, সেটিও দুর্বল। আরেক বর্ণনায় তিনি তা আবু সাঈদ আল-খুদরি ؓ থেকেও মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন, তবে সেটিও দুর্বল। অর্থাৎ বর্ণনাটি মারফু হিসেবে শুদ্ধ নয়। প্রখ্যাত তাবিয়ি ইবন সীরীন থেকে তা বিখ্যাত। অন্যান্য তাবিয়ি ও আতবাউত তাবিয়িনদেরও তা মুখে মুখে ছিল।

» এখানে মূলকথা হচ্ছে,

১. আল্লাহ তাআলা তাঁর বাণীকে ও তাঁর নবির বাণীকে সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন।

> আল্লাহ বলেন, “আর আমরা এ যিকির নাযিল করেছি, আর আমরাই তার সংরক্ষণ করবো।” *[সূরা আল-হিজর: ০৯]*

সুতরাং মুসলিমদের জন্য এ দুটি আঁকড়ে ধরার বিকল্প নেই।

> আল্লাহ বলেন, “আর তোমরা আল্লাহর ও রাসূলের আনুগত্য করো, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।” *[সূরা আলে ইমরান: ১৩২]*

২. আল্লাহ তাআলা এ দীনকে কিয়ামতের আগ পর্যন্ত রাখবেন, তাই একদল সত্যনিষ্ঠ লোক সর্বদা হকের ওপর থেকে এ উম্মাতকে হকের দিশা দিবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> “আমার উম্মাতের মধ্যে সবসময়ই একটি গোষ্ঠী সত্যের ওপর বিজয়ী থাকবে, যারা তাদের ত্যাগ করবে তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত আল্লাহর আদেশ তাদের ওপর এসে পৌঁছায় এবং তারা সে অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে।” *[মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ১৯২০]*

তাই জনসাধারণের উচিত সে হকপন্থিদের অন্বেষণ করে হক গ্রহণ করা, যারা নিজেরা বিভ্রান্ত তাদের থেকে হক কীভাবে গ্রহণ করা হবে?

৩. মুসলিম ছাড়া অন্যান্য উম্মাতের ভুল হতেই থাকবে। কারণ তাদের প্রত্যাবর্তন করার জায়গা নেই, থাকলেও তা আর অবিকৃত অবস্থায় নেই। কিন্তু এ উম্মাতের প্রত্যাবর্তন করার জায়গা রয়েছে, আর তা সর্বদা অবিকৃত থাকবে, যদি কেউ তার ভেতরে কিছু প্রবিষ্ট করতে চাইবে, কিংবা তা থেকে কিছু কমাতে চাইবে সেটার বিরুদ্ধে হকপন্থিরা সদা সোচ্চার থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> “প্রত্যেক আগত জামাআতের মধ্যে নেক, তাকওয়াসম্পন্ন এবং নির্ভরযোগ্য মানুষ (কিতাব ও সুন্নাহর) এ জ্ঞান গ্রহণ করবেন। আর তিনিই এ জ্ঞানের মাধ্যমে (কুরআন-সুন্নাহ) সীমালঙ্ঘনকারীদের রদবদল, বাতিলপন্থিদের মিথ্যা অপবাদ এবং জাহিল-অজ্ঞদের ভুল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে বিদূরিত করবেন।” *[বাইহাকি (২১/৯৪)] সহীহ সনদে।*

২. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

“

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, আহলুস সুন্নাহ'র ভুল (ভুলকারীদের সাথে) আর বিদআতিদের সঙ্গে একই আচরণ করা। প্রকৃতপক্ষে সকল আদম সন্তানই ভুল করে। অতএব, কোনো ব্যক্তি এবং তার ভুলকে যাচাই করার মানহাজ উপরিউক্ত নীতিই হওয়া উচিত।[৮]

”

টীকা-৭

❑ আহলুস সুন্নাহ পরিচিতি:

(আহলুস সুন্নাহ) সালাফগণের আরেক নাম। আহলুস সুন্নাহ তো তারাই যারা তা গ্রহণ করে যার ওপর ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবিগণ। তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়; কারণ তারা দৃঢ়ভাবে তা ধারণ করে থাকে। যেভাবে ধারণ করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> “অতএব, তোমাদের কর্তব্য হবে আমার সুন্নাতকে ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা এবং এ পথ ও পন্থার ওপর দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকবে।” *[আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা. ১৬৬৯৪; আবু দাউদ, আস-সুনান, হা. ৪৬০৭; তিরমিযি, আল-জামিউ, হা. ২৬৭৬; ইবন মাজাহ, আস-সুনান, হা. ৪২]*

আর তারা তা থেকে দূরে থাকে যা থেকে রাসূল ﷺ সাবধান করেছেন, সেটা হচ্ছে,

> “সাবধান! দীনের ভেতরে নতুন নতুন কথার (বিদআত) উদ্ভব ঘটানো হতে বেঁচে থাকবে। কেননা প্রত্যেকটা নতুন কথাই বিদআত এবং প্রত্যেকটা বিদআতই ভ্রষ্টতা।” *[আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা. ১৬৬৯৪; আবু দাউদ, আস-সুনান, হা. ৪৬০৭]*
>
> আরো বলেছেন, “সুতরাং যারা আমার সুন্নাতের প্রতি বিরাগী হবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়।” *[বুখারি, আল-জামিউস সহীহ, হা. ৫০৬৩; মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ১৪০১; নাসায়ি, আস-সুনান, হা. ৩২১৭]*

আহলুস সুন্নাহ তো তারাই, যাদের আকীদাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে প্রকাশিত ছিল, সাহাবিগণের যুগে ছিল। তাই যতক্ষণ কেউ সে আকীদাহ'য় ফিরে না যাবে, সে আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

ইমাম মালিক رحمه الله বলেছেন, “এ উম্মাতের শেষের লোকদের সেটাই সঠিক পথ দেখাবে যা উম্মাতের প্রথম লোকদেরকে দেখিয়েছিল”। এজন্য আহলুস সুন্নাহ কেবল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসের দিকে নিজেকে সম্পৃক্ত করে, অন্যদিকে

বাতিলরা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের দিকে কিংবা মতবাদের দিকে নিজেদের সম্পৃক্ত করে থাকে।

ইমাম শাতিবি ﷺ বলেন, আবদুর রহমান ইবন মাহদি বলেন, "মালিক ইবন আনাসকে সুন্নাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তখন তিনি জবাব দিলেন, যাদের সুন্নাহ ছাড়া আর কোনো নাম নেই। তারপর তিনি

> "আর এ পথই আমার সরল পথ। কাজেই তোমরা এর অনুসরণ করো এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও।" *[সূরা আল-আনআম: ১৫৩]*

আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।" *আল-ই'তিসাম (১/৭৯);* অর্থাৎ আহলুস সুন্নাহর 'সুন্নাহ' ছাড়া আর কোনো নামের দিকে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে না। *ইবনুল কাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন (৩/১৭৯)।*

ইবন আবদিল বার ﷺ বলেন, ইমাম মালিককে এক লোক জিজ্ঞেস করলেন, 'আহলুস সুন্নাহ কারা? তিনি বললেন, আহলুস সুন্নাহ হচ্ছেন তারাই যারা কোনো উপাধিতে পরিচিত নয়, জাহমি নয়, কাদারি নয়, রাফিদি নয়।' *আল-ইন্তিকা, পৃ. ৩৫।*

টীকা-৮

সকল বনী আদমই ভুল করে। কিন্তু যাদের আকীদাহ ও মানহাজ বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়েছে তাদের ভুল আর যাদের আকীদাহ ও মানহাজে সমস্যা রয়েছে তাদের ভুলকে এক কাতারে রাখা যাবে না। তবে অবশ্যই সেটা তখনই হবে যখন ভুলকারী লোকটি বিদআতের দিকে আহ্বানকারী হবে না। যেমন,

১. ইমাম সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব ﷺ (মৃত্যু ৯৩ হি.) বলেন, 'এমন কোনো আলিম নেই, এমন কোনো শরীফ মানুষ নেই, এমন কোনো ফযীলতপূর্ণ মানুষ নেই যার কোনো দোষ নেই, তবে যার ত্রুটির চেয়ে ফযীলত বেশি, তার ত্রুটি ফযীলতের অধীনে হারিয়ে যাবে। অন্যরা বলেন, কোনো আলিম ভুল থেকে নিরাপদ নন, যে-কেউ কম ভুল করবে আর বেশি বিশুদ্ধ করবে, তিনিই

আলিম। আর যে-কেউ কম বিশুদ্ধ করবে আর ভুল বেশি করবে সে জাহিল।' *ইবন আবদিল বার, জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি (২/৪৮)।*

২. ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক ﷺ (মৃত্যু ১৮১ হি.) বলেন, 'যখন কোনো মানুষের গুণ তার ভুলের ওপর প্রাধান্য পাবে, তখন তার ভুলগুলো তুলে ধরা হবে না, আর যখন কোনো লোকের ভুলগুলো তার গুণের ওপর প্রাধান্য পাবে তখন তার গুণগুলো উল্লেখ করা হবে না।' *ইমাম যাহাবি, সিয়ারু আলামিন নুবালা (৮/৩৫২)।*

৩. ইমাম আহমাদ ﷺ (মৃত্যু ২৪১ হি.) বলেন, 'খোরাসানের সাঁকো পার হয়েছে তাদের মধ্যে ইসহাক ইবন রাহওয়িয়াহ'র চেয়ে উৎকৃষ্ট কেউ নেই, যদিও তিনি আমাদের সঙ্গে অনেক বিষয়ে মতভেদ করেন। কারণ মানুষের মাঝে সর্বদা এ ধরনের মতভেদ চলে এসেছে।' *ইমাম যাহাবি, সিয়ারু আলামিন নুবালা (১১/৩৭১)।*

৪. ইমাম আবু হাতিম ইবন হিব্বান ﷺ (মৃত্যু ৩৫৪ হি.) বলেন, আবদুল মালিক ইবন আবু সুলাইমান কুফাবাসীদের উত্তম ব্যক্তিদের একজন, তাদের হাফিযদের অন্যতম। যারাই তাদের হিফয থেকে হাদীস বর্ণনা করে তারাই সাধারণত কিছু 'ওয়াহম' বা সন্দেহে পড়ে যান, তাই যে শাইখের আদালত সাব্যস্ত হয়েছে তার বর্ণনায় কিছু ওয়াহম পাওয়া গেলেই তার হাদীস ছেড়ে দেওয়া ইনসাফের দাবি নয়। যদি এ নীতি অবলম্বন করি তবে তো আমাদেরকে যুহরি, ইবন জুরাইজ, সাওরি, শুবাহর হাদীসও ছাড়তে হয় কিন্তু তারা হাফিযে হাদীস হওয়া সত্ত্বেও মাসূম ছিলেন না। ... সুতরাং তাদের মধ্যে যাদের সন্দেহ-সংশয় কম তাদের হাদীস গ্রহণ করা হবে, আর যাদের ভুল বেশি তাদের হাদীস ত্যাগ করা হবে।... *আস-সিকাত (৭/৯৭-৯৮)।*

৫. শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ ﷺ (মৃত্যু ৭২৮ হি.), বলেন, 'সালাফ ও খালাফদের অনেক মুজতাহিদ বিদআত করেছে ও বলেছে, তবে তারা জানতে পারেনি যে, এটি বিদআত। হয়তো তারা দুর্বল হাদীসকে সহীহ মনে করে বসেছে, অথবা কিছু আয়াত থেকে এমন কিছু বুঝেছেন যা ওই আয়াতের উদ্দেশ্য নয়, অথবা কোনো মাসআলাতে একটি মত তিনি নিয়েছেন কিন্তু এ মাসআলাতে সহীহ সুন্নাহর ভাষ্য তার কাছে পৌঁছেনি।

যখন একজন মানুষ তার রবকে যথাসম্ভব ভয় করবেন, তিনি আল্লাহর এ বাণীর অধীন হতে পারবেন, 'হে আমাদের রব, আমরা যদি ভুলে যাই কিংবা বিস্মৃত হই তবে আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না'। সহীহ হাদীসে এসেছে, আল্লাহ তাআলা এ দুআর বিপরীতে বলেছেন, 'আমি তা করলাম'। *মাজমূ ফাতাওয়া (১৯/১৯১-১৯২)।*

৬. ইমাম যাহাবি ﷺ (মৃত্যু ৭৪৮ হি.) বলেন, 'তারপর ইলমের ইমামগণের বড়ো যিনি, যদি তার বিশুদ্ধ অংশ বেশি হয়, আর তিনি হক তালাশের পথে বেশি শ্রম ব্যয়কারী বলে বিবেচিত হন, তার ইলমও প্রশস্ত হয়, বুদ্ধিমত্তাও প্রকাশিত হয়, সততা, পরহেযগারী ও কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণে প্রসিদ্ধ হন, তবে তার পদস্খলনগুলো ক্ষমার্হ। তাকে আমরা পথভ্রষ্ট বলব না, তাকে আমরা পরিত্যাগ করব না, তার নেক কাজগুলো ভুলে যাব না। হ্যাঁ, তার বিদআতে ও ভুলের তাকে আমরা অনুসরণ করব না, আমরা তার জন্য তা থেকে তাওবাহ নসীব হওয়ার আশা রাখি।' *ইমাম যাহাবি, সিয়ারু আলামিন নুবালা (৫/২৭১)।*

৭. তিনি আরো বলেন, 'যখনই কোনো ইমাম তার ইজতিহাদে কোনো একক মাসআলায় এমন ভুল করে যা ক্ষমার যোগ্য, তার বিরুদ্ধে আমরা দাঁড়িয়ে যাই, তাকে বিদআতি তকমা লাগাই, তাকে পরিত্যাগ করি, তাহলে তো আমাদের জন্য কাউকে নিরাপদ পাবো না, ইবন নাসর নয়, ইবন মানদাহ নয়, তাদের থেকে বড়ো যারা আছে তাদেরও কাউকে নয়। আল্লাহই তো সৃষ্টিকে হকের পথ দেখান, তিনি তো সকল দয়াকারীর চেয়ে দয়ালু। সুতরাং আমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ ও কঠোরতা অবলম্বন থেকে আশ্রয় চাই।' *ইমাম যাহাবি, সিয়ারু আলামিন নুবালা (১৪/৩৯-৪০)।*

৮. তিনি আরো বলেন, 'যদি প্রত্যেক ভুল ইজতিহাদকারীকে তার বিশুদ্ধ ঈমান, হকের অনুসরণের যথেষ্ট প্রচেষ্টার পরও, উক্ত ভুলে পড়ার কারণে তাকে আমরা বাদ দিয়ে দেই ও তাকে বিদআতি তকমা লাগিয়ে দেই, তাহলে তো ইমামগণের মধ্য হতে খুব কমই আমাদের কাছে নিরাপদ পাব। আল্লাহ সকলকে তার দয়া, বদান্যতা দিয়ে রহমতে ঢেকে দিন।' *ইমাম যাহাবি, সিয়ারু আলামিন নুবালা (১৪/৩৭৬)।*

৯. তিনি আরো বলেন, 'আর আমরা সুন্নাত ও আহলুস সুন্নাতকে ভালোবাসি, আলিমকে তার কাছে যতটুকু অনুসরণ ও উত্তম গুণাবলি রয়েছে ততটুকু ভালোবাসি। তারা কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যার ওজর থাকায় যেসব বিদআতে লিপ্ত হয়েছে সেটাকে আমরা ভালোবাসবো না। এ ব্যাপারে ধর্তব্য হবে অধিক পরিমাণের উত্তম কর্মাদি থাকা।' *ইমাম যাহাবি, সিয়ারু আলামিন নুবালা (২০/৪৬)।*

১০. ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﷺ (মৃত্যু ৭৫১ হি.) বলেন, 'ইসলামের ইমামগণের ফযীলত জানা, তাদের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হওয়া, তাদের মর্তবা চেনা, তাদের ফযীলত, ইলম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য তাদের কল্যাণকামিতা ইত্যাদি এটা দাবি করে না যে, তারা যা যা বলবে আমাদের সব গ্রহণ করে নিতে হবে। অনুরূপ সেসব ফাতওয়া মেনে নেওয়া, যা তারা সেসব মাসআলায় প্রদান করেছেন যেখানে তাদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা নিয়ে এসেছেন তা অস্পষ্ট ছিল, ফলে তারা তাদের জ্ঞান অনুযায়ী ফাতওয়া দিয়েছেন, অথচ হক তাদের দেওয়া ফাতওয়ার বিপরীতে। তবে এ কারণে তাদের সকল কথা নিক্ষেপ করা আবশ্যক নয়, তাদের বিরুদ্ধে অপমানজনক কথা বলাও ঠিক নয়, তাদের নিন্দা ও তাদের বদনামে লেগে যাওয়াও উচিত নয়। বস্তুত এ হচ্ছে মধ্যপন্থা গ্রহণের সময় দুটি অত্যাচারী দিক। মধ্যপন্থা এ দুয়ের মাঝখানে। তাই আমরা তাদেরকে গুনাহগারও বলবো না, নিষ্পাপও বলবো না।... যার জ্ঞান রয়েছে শরীআত ও বাস্তব অবস্থার, সে অবশ্যই অকাট্যভাবে জানতে পারে, যে মহৎ ব্যক্তিটির রয়েছে ইসলামে উত্তম পদচারণা, নেক প্রভাব, আর তিনি ইসলাম ও মুসলিমদের মাঝে এমন মর্যাদায় উন্নীত, তারও কখনো কখনো কিছু ভুল ও পদস্খলন হয়ে যেতে পারে। তাকে সেখানে অক্ষম মনে করতে হবে, বরং তিনি ইজতিহাদের জন্য সাওয়াব পাবেন, কিন্তু সে ভুলে তার অনুসরণ করা যাবে না। তবে তার মর্যাদার ব্যাঘাত করা যাবে না, ইমাম হওয়ার ব্যাপারে বিরোধিতা করা যাবে না আর মুসলিমদের অন্তরে তার মর্যাদা নষ্ট হয় এমন কিছু করা যাবে না।' *ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন (৩/২৯৫)।*

১১. ইমাম ইবন রাজাব হাম্বলি ﷺ (মৃত্যু ৭৯৫ হি.) বলেন, আল্লাহ তাআলা নির্ভুল হওয়া কেবল তার কিতাবের জন্যই লিখেছেন। সে ব্যক্তি হচ্ছে ইনসাফকারী যে একজন মানুষের অধিক বিশুদ্ধতার মাঝে অল্প ভুলকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে। *আল-কাওয়ায়িদ, পৃ. ৩।*

৩. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

“

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, মুসলিম জনসাধারণের কাউকে বাদ দিয়ে অপর কাউকে নিয়ে নিজেরা কোনো দলীয় ব্যানার করবে[৯], জোট বানাবে কিংবা কোনো গোপন সমাবেশ করবে।[১০] বর্ণিত হয়েছে: “আপনি যদি তাদের দেখেন যারা জনসাধারণ ছাড়া একান্তে জড়ো হয়েছে, তবে জেনে রাখুন তারা পথভ্রষ্টতা প্রতিষ্ঠার মধ্যে রয়েছে।”[১১]

”

টীকা-৯

❑ শাসক ও শাসিত:

ইসলাম বলে মুসলিম দেশের একজন শাসক সকল শ্রেণির মানুষের মতামত নিয়ে ক্ষমতায় যাবে। ক্ষমতায় যাওয়ার পর সকল শাসিত জনগণ/প্রজাকে সমান দৃষ্টিতে দেখবে। যদি সেখানে শাসকের দৃষ্টিতে সকল প্রজার কল্যাণকামিতা না থাকে, তাহলে শাসক দুনিয়াতে যুলুম করে পার পেলেও আখিরাতে আটকা পড়বে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সারা জীবনে উম্মাতকে কখনো শাসকের বিরুদ্ধে বের হওয়ার জন্য বলেননি। বরং সর্বদা শাসকদের ন্যায়ানুগ কাজ মেনে নিতে ও তাদের অধীন জীবনযাপন করার নির্দেশনা দিয়েছেন। একজন শাসক থাকতে দ্বিতীয় কেউ শাসক হওয়ার চেষ্টা করলে দ্বিতীয়জনকে কঠোরভাবে প্রতিহত করতে বলেছেন, এমনকী যদি সেটা হত্যা পর্যন্তও গড়ায়। (মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ১৮৫২-১৮৫৩) শাসকের যুলুম ও স্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে কখনো বিদ্রোহ করার জন্য অনুমতি দেননি। কিন্তু তখনও তাকে হক কথা বলা, একান্তে নসীহত করা উভয়টি অনুমোদিত বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

তবে যদি শাসকের কর্মকাণ্ড ইসলামবিরোধী হয় তাহলে সেখানে কয়েকটি অবস্থা হতে পারে:

এক. তার ইসলাম বিরোধিতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেনি যা তাকে সরাসরি কুফরিতে পৌঁছে দেয়। এমতাবস্থায় যতক্ষণ তারা সালাত আদায়কারী ও কায়িমকারী হবে ততক্ষণ তার ব্যাপারে কয়েকটি কাজ করা যেতে পারে:

১. আল্লাহর কাছে তার হিদায়াতের জন্য দুআ করা। এটা সালাফরা করতেন।

২. হক কথা তার কাছে তুলে ধরা। এটাও সালাফগণের কারো কারো মানহাজ ছিল, তবে সেখানে সেরকম ব্যক্তিত্ব হওয়া জরুরি যার কথা শাসক আমলে নিবেন।

৩. তাকে একান্ত নসীহত করা। এখানেও নসীহতকারী ও নসীহত গ্রহণকারীর যোগ্যতার বিষয়টি যথাযথভাবে লক্ষণীয়।

৪. যদি তাতে কাজ না হয়, তাহলে আল্লাহর কাছে তার অবস্থা পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করা। যেমনিভাবে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে আলিমরা অপেক্ষা করেছিলেন।

দুই. আর যদি ইসলাম বিরোধিতা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যা তাকে সরাসরি কুফরিতে লিপ্ত করেছে, যার পক্ষে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান, তখন নিম্নোক্ত দুটি অবস্থা হতে পারে:

ক) শর্তপূরণ ও বাধা দূরীকরণ করা হয়নি, তখন যা করতে হবে:

১. তার ওপর কুফরি সংক্রান্ত প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

২. সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করা হতে হবে।

৩. তার কোনো গ্রহণযোগ্য ওজর আছে কি না তা খতিয়ে দেখতে হবে।

৪. উপরিউক্ত প্রথম অবস্থার সবগুলো কাজ করতে হবে।

খ) শর্তপূরণ ও বাধা দূরীকরণ করা ও এতদসংক্রান্ত সবকিছু সম্পন্ন করা হয়ে থাকলে:

১. শাসককে পরিবর্তন করার চেষ্টা থাকতে হবে। তবে তার জন্য কয়েকটি শর্ত পূরণ করতে হবে:

- এর সামর্থ্য থাকতে হবে।
- এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থাপনা আনার ব্যাপারে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত থাকবে।
- এর চেয়ে খারাপ অবস্থা আসবে না, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

২. যদি সেটা সম্ভব না হয়, তবে,

- ব্যক্তি তার পরিধি মোতাবেক দীনের কাজে লেগে থাকবে। গণমুখী কাজ করে যাবে।
- জনগণকে ধীরে ধীরে সচেতন করে তুলতে হবে, তারপর পূর্বোক্ত শর্ত ও বাঁধা দূর হওয়ার পর পরিবর্তন করতে হবে।
- সেভাবে যখন ঈমান ও নেক আমল তাদের মধ্যে পাওয়া যাবে তখন আল্লাহর ওয়াদা সেখানে কার্যকর হবে এবং তিনি তাঁর পছন্দনীয় লোকদের সেখানে ক্ষমতায় বসাবেন।

৩. বর্তমান সময়ের দলীয় অবস্থান কী পরিবর্তন নীতি হিসেবে করা যাবে?

বিষয়টি ইতঃপূর্বে ছিল না। পূর্ববর্তী যুগে পরিবর্তনের জন্য কোনো লোক দাঁড়িয়ে যেতো, তার অনুসারীরারা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিত, অবস্থা বিবেচনা করে লোকেরা তার সঙ্গী হতো, সে কোনো এলাকা দখল করে সেখানকার শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করত। এগুলোতে সালাফগণের বৃহত্তর অংশের কোনো অংশগ্রহণ থাকতো না। বরং পরবর্তী বড়ো বড়ো সালাফগণ এটাকে শুধু নিরুৎসাহিত করেছেন তা নয় বরং কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। কারণ ইতিহাসে এটা প্রমাণিত সত্য হয়েছে যে, যখনই কোনো মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে জনগণকে নিয়ে মাঠে নামা হয়েছে সেটার পরিণতি ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য সুখকর হয়নি।

যদি বলা হয়, বর্তমানে সে অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এখন একই রাষ্ট্রে (তথাকথিত) গণতন্ত্রের নামে ভিন্নমতের দল, জোট গঠনের অনুমতি দেওয়া হয়। তাহলে কি সেগুলোতে অংশগ্রহণ করা যাবে?

না, কারণ দেখা গেছে ইসলাম ও মুসলিমদের ওপর এর ক্ষতির ভয়াবহতা অনেক বেশি:

- এর মাধ্যমে মুসলিমদের ইসলাম বিরোধিতাকে মেনে নেওয়া হচ্ছে।
- এর মাধ্যমে মুসলিমরা অমুসলিমদের নীতি ও বুলি দিয়ে মানুষদের জমায়েত করছে।
- এর মাধ্যমে ঈমানদার ও কাফিরের আলাদা স্বাতন্ত্রবোধ থাকছে না।
- এর মাধ্যমে মুসলিমদের মধ্যে নিষিদ্ধ দলাদলি ও ভাগ হওয়াকে অনুমোদন করা হয়েছে।
- এর মাধ্যমে অমুসলিমদের নীতি মুসলিমদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।
- এর মাধ্যমে তথাকথিত অধিকাংশ নীতিকে শর্তহীনভাবে অনুমোদন করা হয়েছে।

- এর মাধ্যমে তথাকথিত কিছু মুসলিম দল করতে গিয়ে নিজেদের মডারেট দাবি করে দীনকে কাটছাঁট করে নিয়েছে।
- এর মাধ্যমে জেনে বা না জেনে তারা বহু হারামকে হালাল হিসেবে নিয়েছে।
- এর মাধ্যমে মুসলিমরা পরস্পর হানাহানি, মারামারি পর্যন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।
- এর মাধ্যমে মুসলিমরা পরস্পরকে ইসলাম ভিন্ন অপর কিছুর জন্য ভালোবাসার ও শত্রুতা পোষণের নীতি বানিয়ে নিয়েছে।

এমতাবস্থায় আমাদের সালাফে সালিহীনের নীতিকে আঁকড়ে থাকা উচিত। এসব দলীয় ব্যানার, প্লাটফর্ম, জোট থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখাই হচ্ছে সঠিক নীতি। আল্লাহ তাআলার বাণী,

> "আর তোমরা সকলে আল্লাহর রশি দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো, তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা তো অগ্নিগর্তের দ্বারপ্রান্তে ছিলে, তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা হিদায়াত পেতে পার।" *[সূরা আলে-ইমরান: ১০৩]*

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

> "তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।" *[সূরা আলে-ইমরান: ১০৫]*

আরো বলেন,

> "নিশ্চয় যারা তাদের দীনকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোনো দায়িত্ব আপনার নয়; তাদের বিষয় তো আল্লাহর নিকট, তারপর তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানাবেন।" *[সূরা আল-আনআম: ১৫৯]*

অনুরূপ এক আসারে এসেছে, উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামাহ রضي الله عنها বলেন, "নিশ্চয় তোমাদের নবি ﷺ তাদের থেকে নিজেদের বিমুক্ত ঘোষণা করেছেন, যারা নিজেদের দীনকে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়েছে ও দলবাজি করেছে।" *[শাতিবি, আল-ই'তিসাম (১/৮০)]*

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালিহ আল-উসাইমীন رحمه الله বলেন, 'তাদের কারো কথা যে, দল না থাকলে দাওয়াত শক্তিশালী ও প্রসারিত হয় না। আমরা বলবো, এ কথাটি শুদ্ধ নয়। বরং দাওয়াত তখনই শক্তিশালী ও প্রসারিত হবে, যখনই কেউ কুরআন ও সুন্নাহকে বেশি আঁকড়ে থাকবে।'

টীকা-১০

ইসলাম হচ্ছে প্রকাশ্য নীতির নাম। প্রতিটি মানুষ তথ্য জানার অধিকার রাখে। কেবল প্রত্যেকে তার নিজের ও তার পরিবারের ব্যাপারে তথ্য গোপন করতে পারে। রাষ্ট্রের প্রধান ও তার প্রতিনিধি যে বিষয় গোপন রাখা প্রয়োজন সেটা করতে পারে। কিন্তু জনসাধারণের জন্য কিছু মানুষদের নিয়ে আলাদা গোপন বৈঠকের নিয়ম নেই; বিশেষ করে যেখানে ইসলামি রাষ্ট্র থাকবে। তাওহীদের দাওয়াত ব্যতীত আর কিছু নিয়ে নবিদের পক্ষ থেকে গোপনে বসার নজির দেখা যায় না। এ ব্যাপারে আমরা একটি হাদীস পাই, তা হচ্ছে,

> "ইবন উমার رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, এক লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে অসিয়ত করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর ইবাদাত করবে, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না, সালাত কায়িম করবে, যাকাত প্রদান করবে, রামাদানের সাওম পালন করবে, হজ করবে, উমরা করবে, (আমীরের নির্দেশ) শুনবে, আনুগত্য করবে, প্রকাশ্য নীতিতে থাকবে, গোপনীয় কিছু করবে না।"
> *[ইবন আবি আসিম, আস-সুন্নাহ, নং ১০৭০; শারহু মুশকিলুল আসার, নং ২৬৫৮; হাকিম, মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন, নং ১৬৬; লালেকাঈ, শারহু উসূলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ, নং ৩৩৩; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, নং ৩৬৯০; মারওয়াযি, মুখতাসারু কিয়ামিল্লাইল, নং ২৭৩; ইবনুল মুবারাক, আল-জিহাদ, নং ১৬৪; কিওয়ামুস সুন্নাহ, আল-হুজ্জাহ, নং ২৫৩]*

অনুরূপ আরেকটি 'সাহাবির আসার' পাই, তা হচ্ছে,

"উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ'র কাছে খবর পৌঁছে যে, কিছু মানুষ ফাতিমার ঘরে একত্রিত হচ্ছে, তখন উমার ﷺ ফাতিমা ﷺ'র কাছে এসে বললেন, হে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা, আপনার পিতার চেয়ে প্রিয় আমাদের কাছে আর কেউ নেই, আর আপনার পিতার পরে আপনার চেয়ে প্রিয় আর কেউ নেই আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, এ লোকগুলো আপনার এখানে জমায়েত হয়। আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি আমার কাছে খবর যায়, আমি তাদের ঘর পুড়িয়ে দিব। অতঃপর যখন পুনরায় এল তখন ফাতিমা ﷺ তা তাদের জানিয়ে বললেন, ইবনুল খাত্তাব এমন এমন বলেছে, আমার মনে হয় সে তা করেই ছাড়বে। অতঃপর তারা সরে পড়ে, এভাবেই আবু বকর ﷺ'র বাইআত সম্পন্ন হয়।" *[ইবন আবি শাইবাহ, আল-মুসান্নাফ (১৪/৫৬৭-৫৬৮); ইবন আবি আসিম, আল-মুযাক্কির ওয়াত তাযকীর, পৃ. ৯১, নং ১৯, সহীহ সনদে যাইদ ইবন আসলাম, তার পিতা থেকে]*

এগুলো এবং সামনে বর্ণিত 'আসার' প্রমাণ করে যে, ইসলামে আলাদা কোনো গোপন মিটিং বা সিটিং নেই। সুতরাং বিষয়টি আমাদের ভালোভাবে স্মরণ রাখা উচিত।

টীকা-১১

এটি মূলত উমার ইবন আবদুল আযীয ﷺ'র বক্তব্য। তিনি বলেছিলেন, "যখন কিছু মানুষকে দেখবে সাধারণ মানুষদের বাদ দিয়ে একান্তে শলা-পরামর্শে নিয়োজিত আছে তখন জেনে রাখবে যে, তারা পথভ্রষ্টতা প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে।" *[ইমাম আহমাদ, আয-যুহদ, পৃ. ৪০৮-৪১০; দারিমি, আস-সুনান (১/৯১); আবু নুআইম, আল-হিলইয়া (৫/৩৩৮); ইবন আবদিল বার, জামিউ বায়ানিল ইলম (২/৯৩২), আসার নং ১৭৭৪; কিওয়ামুস সুন্নাহ ইসমাঈল আত-তাইমি, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, নং ৩৬৮; লালেকাঈ, শারহু উসূলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ, নং ২৫১; ইবনুল জাওযি, সীরাতে উমার ইবন আবদিল আযীয, পৃ. ৮৬]*

৪. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

"

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, জনসাধারণকে তাদের শাসকের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলা এবং তাদেরকে বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, ও বিরুদ্ধাচারণে উৎসাহিত করা[১২] অথবা জনসম্মুখে শাসকের বা মন্ত্রীদের অথবা তাদের সমর্থনকারীদের সমালোচনা করা।[১৩]

"

টীকা-১২

শাসকের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা, বিদ্রোহ করা কখনো সালাফগণের নীতি ছিল না। এগুলো প্রথম করেছিল ফিতনাবাজ বাগী [বিদ্রোহী] গোষ্ঠী উসমান ইবন আফফান ﷺ'র বিরুদ্ধে। সে ফিতনা আজ পর্যন্ত মুসলিমদের বিপদে ফেলে দিয়েছে।

টীকা-১৩

❑ **শাসকদের প্রকাশ্য সমালোচনার বিধান:**

শাসকদের সমালোচনা কি জনসম্মুখে করা যায়? বিষয়টিতে আমরা সাহাবায়ে কিরামের বক্তব্য নিতে পারি। আনাস ﷺ বলেন, "আমাদেরকে আমাদের বড়োরা, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবি ছিলেন, তারা নিষেধ করেছেন যে, তোমরা তোমাদের শাসকদের গালি দিয়ো না, তাদেরকে ধোঁকা দিয়ো না, তাদের অবাধ্য হয়ো না, বরং সবর করো। আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো, কারণ বিষয়টি আসন্ন।" *ইবন আবি আসিম, আস-সুন্নাহ (২/৪৮৮); ইবন আবদিল বার, আত-তামহীদ (২১/২৮৭); আবুল কাসিম আত-তাইমি, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (৩/৬৮); বাইহাকি, শুআবুল ঈমান (১৩/১৮৬-২০২)।*

অনুরূপ আবদুল্লাহ ইবন উকাইম ﷺ বলেন, 'আমি উসমানের পরে আর কোনো খলীফার রক্ত প্রবাহে কাউকে সাহায্য করবো না। তখন তাকে বলা হলে, আবু মাবাদ! আপনি কি তার রক্ত প্রবাহে সাহায্য করেছেন? তিনি বললেন, আমি মনে করি তার দোষ বর্ণনা করাই তার রক্ত প্রবাহে সাহায্য করা।' *ইবন আবি শাইবাহ, আল-মুসান্নাফ (১২/৪৭); ইবন সা'দ, আত-তাবাকাত (৬/১১৫); ফাসাওয়ি, মা'রিফাতু ওয়াত তারীখ (১/২৩১-২৩২)।*

তদ্রূপ আবু বাকরাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে উসমান ﷺ কর্তৃক নিয়োজিত গভর্নর আবদুল্লাহ ইবন আমিরের দোষ বর্ণনা করে বলছে, দেখ আমাদের আমীরকে সে তো ফাসিকের কাপড় পরেছে। তখন আবু বাকরাহ ﷺ বললেন, চুপ করো! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'যে-কেউ জমিনের বুকে আল্লাহর শাসকের মানহানি করবে, আল্লাহও তার মানহানি করুন।' *তিরমিযি, আল-জামিউস সহীহ (৪/৫০২)।*

এজন্য আবু ইসহাক আস-সাবিঈ বলেন, 'যখনই কোনো জাতি তাদের শাসককে গালিগালাজ করবে তখনই তারা তার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে।' *[আবু আমর আদ-দানি, কিতাবুল ফিতান, নং ১৪৬; ইবন আবদুল বার, আত-তামহীদ (২১/২৮৭)]*

ইমাম বারবাহারি ﷺ বলেন, "যখন তুমি দেখবে কোনো লোককে যে সে শাসকের ওপর বদ-দুআ করছে, তখন তুমি জেনে নিও যে, প্রবৃত্তির অনুসারী। আর যখন তুমি দেখবে যে শাসকের কল্যাণের জন্য দুআ করছে তখন জেনে নিও যে, সে সুন্নাতের অনুসারী ইনশাআল্লাহ।" *[বারবাহারি, শারহুস সুন্নাহ।]*

আরেকবার বাগদাদের ফকীহগণ খলীফা ওয়াসিক-এর সময় আবু আবদুল্লাহ আহমাদ ইবন হাম্বলের কাছে একত্রিত হয়ে বললেন, 'আমরা দেখছি বিষয়টি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে, (কুরআন সৃষ্ট বলার মাসআলায়), আমরা তার শাসনে সন্তুষ্ট নই, তার ক্ষমতাও মানি না। তখন আবু আবদুল্লাহ আহমাদ ইবন হাম্বল তাদের সঙ্গে বিতর্কে জড়ালেন এবং বললেন, 'তোমরা অন্তর দিয়ে ঘৃণা করো, তবে তার আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিও না, মুসলিমদের লাঠি ভঙ্গ করো না, তোমাদের রক্ত প্রবাহিত করো না, তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমদের রক্তও প্রবাহিত করো না পরিণাম কী হতে পারে ভালো করে চিন্তা করো, সবর করো, যতক্ষণ না নেককার আরাম পায়, আর বদকার থেকে মানুষ আরাম পাচ্ছে। আর তিনি বলেন, আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়া সঠিক কাজ নয়, এটি সালাফগণের থেকে আসা যাবতীয় বক্তব্য পরিপন্থি বিষয়।' *ইবন মুফলিহ, আল-আদাবুশ শারঈয়্যাহ (১/১৯৫-১৯৬); আল-খাল্লাল, আস-সুন্নাহ, পৃ. ১৩৩।*

সাহল ইবন আবদুল্লাহ আত-তুসতারি ﷺ বলেন, 'মানুষ যতক্ষণ শাসক ও আলিমগণকে সম্মান করবে ততক্ষণ কল্যাণে থাকবে, যখন তারা এ দুশ্রেণিকে সম্মান করবে তখন আল্লাহ তাদের দুনিয়া ও আখিরাত ঠিক করে দিবেন। আর যখন তারা এ দুটি শ্রেণিকে অপমানিত করবেন তারা তাদের দুনিয়া ও আখিরাত বরবাদ করে দিবে।' *কুরতুবি, আত-তাফসীর (৫/২৬০-২৬১)।*

তবে আমাদের উদ্দেশ্য শাসকদের ভুল দেখে চুপ করে থাকা নয়, তবে ইসলাহ ও পরিবর্তনের নিয়তে কাজ করা ভিন্ন বিষয়।

শাসকদের যদি কেউ ইসলাহ বা সঠিক পথে ফেরাতে চায়, তবে তাকে নিম্নোক্ত মূলনীতিগুলো মেনে চলতে হবে:

১. অন্যায় কাজ পরিবর্তনের জন্য ইসলাম যে তিনটি স্তর দিয়েছে: হাত, মুখ ও অন্তর, এগুলোকে সক্ষমতা অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে। তাই যা করলে শাসকের ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হয়, ফিতনার উন্মেষ ঘটে, অকল্যাণ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এমনসব কাজ কখনো করা যাবে না।

২. শাসকের জন্য উত্তম নসীহত, আখিরাতের ভয় ব্যবহার করা উত্তম নীতি।

৩. শাসকের দোষ জনসম্মুখে ও মিম্বরে প্রচার করে তাদের মান-সম্মান নষ্ট করা যাবে না। *[শাসক ও শাসিতের অধিকার, ইবন বায, পৃ. ২৭-২৮]*

৪. বিভিন্ন বৈঠকে ও আলোচনায় তাদের বদনাম করে বেড়ানো পরিত্যাগ করতে হবে।

এসবের কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি হাদীস, রাসূল ﷺ বলেন,

> "তোমাদের কেউ যদি শাসককে কোনো নসীহত করতে চায় সে যেন তা প্রকাশ্যে না বলে, বরং তার হাত ধরে যেন একান্ত হয়, তারপর যদি সে গ্রহণ করে সেটা ভালো, আর যদি কবুল না করে, তাহলে সে তার দায়িত্ব পালন করেছে।" আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা. ১৫৩৩৩; হাকিম, আল-মুসতাদরাক (৩/২৯০); মাজমাউয যাওয়ায়িদ (৫/২২৯); ইবন আবি আসিম, আস-সুন্নাহ (২/৫২৩)। শাইখ আলবানি বলেন, হাদীসটি সহীহ।

৫. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

"

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, ফরয ইলম[১৪] তালাশ করা থেকে বিরত থাকা এবং প্রয়োজনীয় ইলমকে উপেক্ষা করা।[১৫]

"

টীকা-১৪

এখানে ইলম বলতে শরঈ ইলম বোঝানো হয়েছে, যা কুরআন ও সুন্নাহ নির্ভর। শরীআতে সেটারই প্রশংসা করা হয়েছে এবং তা অর্জনের জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, আর যা তার অর্জনকারীকে মহান আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগরূক করে দেয়। *[সূরা ফাতির: ১৮]*

টীকা-১৫

❑ **গুরুত্বভেদে বিভিন্ন প্রকার ইলম :**

ইসলামি শরীআতের সকল বিধান এক রকম নয়, একটির চেয়ে অপরটি গুরুত্বপূর্ণ। তন্মধ্যে যা জানতেই হবে তা হচ্ছে ঈমান, উসূলুল ঈমান, ইসলাম, আরকানুল ইসলাম, মৌলিক হালাল-হারাম। দুর্ভাগ্যবশত দেখা যায় অনেককেই তারা দুনিয়ার সকল ইলম অর্জনে আত্মনিয়োগ করলেও এসব ফরয বিষয়ের ইলম অর্জনে প্রয়োজনীয় শ্রম ও সময় দিচ্ছে না।

সালাফে সালিহীন কখনো শরঈ ফরয ইলম বাদ দিয়ে অন্য কিছু অর্জনের পিছনে দৌড়াতেন না; কারণ–

১. তখনই একজন মানুষ সালাফগণের মানহাজে থাকতে পারবেন যখন তিনি দীন সঠিকভাবে জানতে পারবেন যখন সে আল্লাহ সম্পর্কে জানবে, তাঁর নাম ও গুণাবলি সম্পর্কে জানবে, তাঁর কর্ম ও অধিকার সম্পর্কে জানবে। এগুলো জানতে হলে দীনী ইলম অর্জন করতে হবে। আর তা শিখতে হবে মূল সোর্স থেকে। কোনো ফযীলতের বই, কিংবা রাজনৈতিক বই থেকে নয়, অবশ্যই তা শিখতে হবে সালাফগণের রেখে যাওয়া 'তুরাস' অর্থাৎ জ্ঞানের ওয়ারিশ থেকে।

২. দীনী ইলম না শিখলে ইসলামকে তখন অজ্ঞতার সঙ্গে আমল করতে হবে। ফলে দীনের উপকারের চেয়ে ক্ষতি করবো বেশি। যা উপনিবেশবাদীরা চেয়েছে আর আমরা বাস্তবায়ন করে চলেছি।

৩. এর প্রয়োজনীয়তা খাবার ও পানীয়ের চেয়ে কোনো অংশেই কম না।

৪. এর অনুপস্থিতিতে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র বিদআত, শির্ক ও কুসংস্কারে পূর্ণ হয়ে যাবে।

৫. এর অনুপস্থিতিতে ধ্বংসাত্মক মতবাদসমূহের প্রচার-প্রসার হতে থাকবে, ফলে সালাফগণের মানহাজে টিকে থাকাই মানুষের জন্য দুষ্কর হয়ে যাবে।

৬. মানুষের মাঝে সন্দেহ-সংশয়ের সয়লাব হয়ে যাবে।

৭. শরীআহ বুঝতে অক্ষম হবে আর তখন তা কেবল নিছক কিছু ইবাদাতে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে। অন্যান্য বিষয়ে কাফিরদের কাছ থেকে বিধান ধার করে নিবে।

৮. কাফির ও মুসলিমদের পার্থক্য লোপ পাবে। ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম এক রকম করে দেখতে আরম্ভ করবে।

৯. বন্ধুত্ব ও শত্রুতার নীতি সম্পর্কে মানুষ অজ্ঞ থেকে যাবে।

১০. দীনী ইলম শিক্ষা গ্রহণ না করা ইলম উঠে যাওয়ার কারণ হবে, যা কিয়ামতের একটি আলামত হবে।

> আল্লাহ তাআলা বলেন, "সময়ের শপথ, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মাঝে নিপতিত, কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আর পরস্পরকে উপদেশ দিয়েছে হকের এবং উপদেশ দিয়েছে ধৈর্যের।" *[সূরা আল-আসর: ১-৩]*

৬.

এটা সালাফগণের
মানহাজ নয়!

“

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, আলিমদেরকে আক্রমণ করা এবং তাদের বিরুদ্ধে বলা, তাদের জ্ঞান ও বইসমূহকে প্রত্যাখ্যান করা, নিছক একটি ভুলে পতিত হওয়ার কারণে তাদের বই পোড়ানো, ধ্বংস এবং তাদের বর্জনের আহ্বান করা।[১৬]

”

টীকা-১৬

এখানে কয়েকটি বিষয় জানা দরকার:

❑ প্রথমত: আলিমের পরিচয়

আলিম তো তারাই, যারা আল্লাহর শরীআত জানে, তাঁর দীনের ফিকহের জ্ঞান রাখে, যা জেনেছে তা অনুসারে হিদায়াত ও সঠিক জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে; যাদেরকে আল্লাহ তাআলা হিকমত দান করেছেন।

আলিম তো তারাই, যাদের ওপর আল্লাহ তাআলা মানুষদের ঝুঁকতে বলেছেন, তারা ফিকহ ও অন্যান্য জ্ঞানে সেরা, দীন ও দুনিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞ। *[ইবন জারীর আত-তাবারি, জামিউল বায়ান (৩/৩২৭)]*

আলিম তো তারাই, যারা ইসলামের ফকীহ বলে বিবেচিত, যাদের ফাতওয়ার দিকে সাধারণরা ফিরে আসে, যারা মাসআলা বের করার ক্ষমতা রাখে, যারা হালাল ও হারামের নীতিমালা যথাযথভাবে সুদৃঢ়ভাবে হিফাযত করেন। *[ইবনুল কাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন (১/৭)]*

আলিম তো তারাই, যারা দীনের ইমাম, দীনী ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে সবর করেছে, প্রচেষ্টা চালিয়েছে, পূর্ণ দৃঢ়বিশ্বাসের সঙ্গে চলেছে। *[সূরা আস-সাজদাহ:২৪]*

আলিম তো তারাই, যারা নবিদের ওয়ারিশ, তারা নবির ইলম গ্রহণ করেছে। তারা সেগুলোকে তাদের বক্ষে ধারণ করেছে, তাদের কর্মকাণ্ডে সেটার প্রকাশ ঘটেছে, তারা মানুষদের সেদিকেই আহ্বান করছে।

আলিম তো তারাই, যারা মুসলিম জনসাধারণ থেকে বের হয়েছে দীনের গভীর জ্ঞান ফিকহ অর্জনের জন্য, তারপর তারা দাওয়াত ও ভীতিপ্রদর্শনের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে। *[সূরা আত-তাওবাহ: ১২২]*

আলিম তো তারাই, যারা মানুষের হিদায়াতের কাজ করেন। কোনো সময় জমিন তাদের থেকে শূন্য হবে না, যতক্ষণ না আল্লাহর নির্দেশ আসছে, সর্বদা তারা আল্লাহর দীনের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে। *[বুখারি, আল-জামিউস সহীহ (৮/১৪৯); মুসলিম, আস-সহীহ (৩/১৫২৪), হা. ১৯২০]*

আলিম তো তারাই, যারা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাথার মুকুট, যে গোষ্ঠীকে অনুসরণ করতে হবে, আর যাদের থেকে পৃথক হওয়ার ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে। *[বুখারি, আল-জামিউস সহীহ (৯/৬); মুসলিম আস-সহীহ (৩/১৩০২); আহমাদ, আল-মুসনাদ (৪/১৩০, ২০২)]*

ইমাম ইবনুল মুবারাক ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, উক্ত জামাআত কারা? তিনি উত্তরে বলেন, আবু বকর, উমার,... এভাবে গুণতে গুণতে তিন মুহাম্মাদ ইবন সাবিত, হুসাইন ইবন ওয়াকিদ পর্যন্ত বর্ণনা করলেন। তখন বলা হলো, এরা তো মারা গেছেন, জীবিতদের মধ্যে কে? তখন তিনি জবাব দিলেন, আবু হামযাহ আস-সুক্কারি। *শাতিবি, আল-ই'তিসাম (১/৭৭১)।*

❑ দ্বিতীয়ত: আলিম চেনার উপায়:

তাদের চেনার জন্য বেশ কিছু পদ্ধতি রয়েছে –

১. তারা তাদের ইলমের মাধ্যমে পরিচিতি লাভ করবেন। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মীরাস নিয়ে কথা বলবেন, মানুষ যখন সেটা জানতে চাইবে তারা তাদেরকে তা দিয়ে ধন্য করবেন।

২. সন্দেহ সংশয়ের জায়গায় তারা সর্বদা দৃঢ়পদ থাকতে পারে। *[ইবনুল কাইয়িম, মিফতাহু দারিস সাআদাহ (১/১৪০)]*

৩. তারা ইবাদাত ও আল্লাহর ভয়ে সর্বদা পরিচিত। *[সূরা ফাতির: ২৮]*

৪. তাদেরকে চেনা যাবে দুনিয়াপ্রীতি ও দুনিয়ায় বড়ো হওয়ার প্রবণতামুক্তি থেকে।

৫. তাদের উস্তাদদের প্রশংসার দ্বারা তাদেরকে চেনা যাবে।

৬. তাদেরকে চেনা যাবে তাদের দারস, ফাতওয়া ও গ্রন্থের মাধ্যমে।

❑ তৃতীয়ত: আলিম ও গাইরে আলিমের মধ্যকার পার্থক্য:

প্রথমত: পার্থক্য করা দরকার আলিম ও কারি সাহেবদের মাঝে। বর্তমান সময়ে কারিদের সংখ্যা অনেক। কিন্তু তাদের সকলে আলিম নয় এটা সর্বজনবিদিত।

দ্বিতীয়ত: পার্থক্য করা দরকার আলিম ও কুরআন পাঠকদের মাঝে। বর্তমানে আধুনিক শিক্ষিত পাঠকরাও ইলমের দাবি করছে। অথচ তাদের কাছে সালাফগণের জ্ঞানের কিছুই নেই; হয় তারা বুঝে না অথবা নিজেদের মনোমতো করে বুঝে নেয়।

তৃতীয়ত: আলিম ও চিন্তাবিদ-সুশীলদের মধ্যকার পার্থক্য করতে হবে। কারণ কাদের আলিম বলে তা আমরা জেনেছি, কিন্তু বর্তমানে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের তথাকথিত চিন্তাবিদদের কথা যারা বেশি জানে, তাদের মতো করে যারা চিন্তা করে তাদেরকেই আলিম মনে করা হচ্ছে, এ হচ্ছে ইলমের সংজ্ঞায় জালিয়াতি।

চতুর্থত: আলিম ও খতীব-ওয়ায়েযের মধ্যে পার্থক্য করা জরুরি। যুগ যুগ ধরে এ পার্থক্য ছিল। আলিমরা এসব খতীব ও ওয়ায়েয থেকে লোকদের সাবধান করত, তাদের বক্তব্য গ্রহণে দ্বিধা করতো। *[দেখুন: আল-আদাবুল মুফরাদ, নং ৭৮৯]*

পঞ্চমত: আলিম ও কালামশাস্ত্রবিদদের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। কারণ কালামশাস্ত্রবিদ বা দর্শন পড়ুয়া লোকদের থেকে ইলম নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। অথচ আজ তাদেরকেই আলিম মনে করা হচ্ছে, যেমন ইবন সীনা, ফারাবি, কিন্দি প্রমুখ। তারা আলিম নয়। অনুরূপ কালামশাস্ত্রবিদদের অনেকেই গ্রীকদর্শন ভালোই জানে, কিন্তু কুরআনের সঠিক তাফসীর ও হাদীসের ব্যাখ্যা সম্পর্কে তারা অজ্ঞই থেকে যায়।

❑ চতুর্থত: আলিমগণের মর্যাদা

এটা মনে রাখতেই হবে যে, আলিমগণের যে মর্যাদা ইসলামে রয়েছে অন্য কারো মর্যাদা তেমন নেই। কারণ আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তাদেরকে এ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। আল্লাহর বিধানের ওপর তাদেরকে পথপ্রদর্শক করেছেন। তাই দুটি জিনিস এখানে জেনে নেওয়া জরুরি:

এক. আলিমগণের এ মর্যাদার কারণ ব্যক্তিগত নয়, শরীআত কর্তৃক প্রদত্ত, তাদের আনুগত্য করা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার, তাদের কথা মেনে নেওয়া আবশ্যক।

দুই. তাদের আনুগত্য ব্যক্তিগত কারণে নয়, বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের জন্য।

আলিমগণের মর্যাদার দলীল লিখে শেষ করা যাবে না, তবে কিছু বর্ণনা প্রদান আশা করি দূষণীয় হবে না। যেমন,

- আল্লাহ তাদের আনুগত্য করতে বলেছেন। *[সূরা আন-নিসা: ০৫]*
- আল্লাহ তাআলা অন্যদেরকে সংশয়-সন্দেহ হলে তাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে বলেছেন। *[সূরা আল-আম্বিয়া: ০৭]*
- আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সবচেয়ে বড়ো সাক্ষ্য (তাওহীদ এর সাক্ষ্য) প্রদানে অংশীদার করেছেন। *[সূরা আলে ইমরান: ১৮]*
- আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ও অন্যান্যদেরকে সমান মনে করতে নিষেধ করেছেন। *[সূরা আয-যুমার: ০৯]*
- আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সমঝদার বলে ঘোষণা করেছেন। *[সূরা আল-আনকাবূত: ১৮]*
- আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আল্লাহভীতির দ্বারা সুশোভিত করেছেন। *[সূরা ফাতির: ২৮]*
- আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা অকল্যাণ বুঝে ও অকল্যাণের রাস্তা সম্পর্কেও তারা বেশি ওয়াকিফহাল। *[সূরা আন-নাহল: ২৭]*
- রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে নবিদের ওয়ারিশ বলেছেন। *[আহমাদ, আল-মুসনাদ (৫/১৯৬)]*
- রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে প্রচারকারী নিয়োগ করেছেন। *[আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা. ২৯৪৭]*
- আল্লাহ তাআলা তাদের দ্বারা কল্যাণের ইচ্ছা করেছেন। *[বুখারি, আল-জামিউস সহীহ (৪/৪৯); মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ১০৩৭]*
- আলিমগণের অস্তিত্ব মানুষের নাজাতের কারণ, নাহলে ধ্বংস অনিবার্য *[বুখারি, আল-জামিউস সহীহ (০১/১৭৪, ১৭৫); মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ২৬৭৩]*

- মানুষ সর্বদা আলিমদের দিকে মুখাপেক্ষী, খাবার ও পানীয়ের চেয়েও। *[ইবনুল কাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন (২/২৫৬)]*

❑ পঞ্চমত: আলিমগণের সঙ্গে আমাদের আচরণ

আলিমগণের সঙ্গে আমাদের আচরণ হবে:

১. বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক।

২. তাদের মর্যাদা ও সম্মান বজায় রাখা।

৩. তাদের থেকে জ্ঞান অর্জন করা ও তাদের দিকে ধাবিত হওয়া।

৪. তাদের বদনাম করা থেকে বেঁচে থাকা।

৫. না জেনে আলিমগণের ভুল ধরা থেকে সাবধান হওয়া।

৬. আলিমগণের কাছে প্রত্যাবর্তন করা, তাদের মতের দিকে ফিরে যাওয়া, বিশেষ করে ফিতনার বিষয় ও ফিতনার সময়ে।

৭. আলিমগণের জন্য ওজর তালাশ করা।

৮. আলিমগণের অনেকের ওপরই মানুষ বিভিন্ন কথা বলেছে, তাই তাদের বিরুদ্ধে কথা বলার আগে পরীক্ষা করে নেওয়া।

৯. আলিমগণের ব্যাপারে বিধান দেওয়ার আগে তাদের মধ্যে যাদের ফযীলত বেশি তাদের ব্যাপারে খারাপ বিষয়গুলো বর্ণনা না করা। যেমন: বাইহাকি, ইবন হাজার, নাওয়াওয়ি প্রমুখ ইমামগণ।

১০. আলিমগণের পদস্খলনের ব্যাপারে জ্ঞাত হওয়া ও তার অনুসরণ না করা।

১১. আলিমগণের সামসময়িক ব্যক্তিদের কথার ব্যাপারে খুব বেশি ভ্রূক্ষেপ না করা, তবে যদি আকীদাহ ও মানহাজের বিষয়ে বিভ্রান্তির প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় সেটা ভিন্ন কথা।

১২. আলিমগণের মর্যাদার যথাযথ হক আদায় করা।

১৩. মুজতাহিদ আলিমগণের ব্যাপারে ইনসাফ বজায় রাখা।

১৪. আলিমগণের বিরুদ্ধে দ্রুত প্রতিবাদে নেমে না যাওয়া।

১৫. আলিমগণের ব্যাপারে মানুষের অন্তরে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করা।

৭. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

“

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, কোনো একজনের মতকে নিয়ে গোঁড়ামি করা এবং এর প্রতি অতিভক্তি করা,[১৭] যেমন তাদের কেউ একজন বলতে পারে: আমি যার ওপর আছি তাই হক যদিও সেটা ভুল হতে পারে এবং আমার বিরোধী ভুলের উপর আছে যদিও তা হক হতে পারে।[১৮]

”

টীকা-১৭

গোঁড়ামি বা তাআসসুব এর অর্থ কোনো কথা বা মত বা ব্যক্তির পক্ষ নেওয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা। যখন সেটা না জেনে করা হবে তখন সেটা হবে গোঁড়ামি। কিন্তু হক জানার পরে সেটার ওপর অটল থাকাকে গোঁড়ামি বলা হবে না। সুতরাং অনেকে যে বলে থাকে, সালাফিরা তাদের সালাফগণের মত ধারণ করার ওপর গোঁড়ামি করে, তা অবশ্যই ভুল। কারণ এটাকে বাড়াবাড়ি বলা হবে না। এটা হচ্ছে দৃঢ়পদ থাকা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তার দীনের ওপর দৃঢ়পদ থাকার ব্যাপারে দুআ করতে শিখিয়েছেন।

> আল্লাহ বলেন, “হে আমাদের রব! সরল পথ দেওয়ার পর আপনি আমাদের অন্তরসমূহকে সত্য লঙ্ঘনপ্রবণ করবেন না। আর আপনার কাছ থেকে আমাদেরকে করুণা দান করুন, নিশ্চয়ই আপনি মহাদাতা।” *[সূরা আলে ইমরান: ০৮]*

> আরো বলেন, “এ কথা ছাড়া তাদের আর কোনো কথা ছিল না, ‘হে আমাদের রব! আমাদের পাপ এবং আমাদের কাজের সীমালঙ্ঘন আপনি ক্ষমা করুন, আমাদের পা সুদৃঢ় রাখুন এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন’।” *[সূরা আলে ইমরান: ১৪৭]*

আর আল্লাহ তাআলাই ঈমানদারদেরকে হিদায়াতের ওপর দৃঢ়পদ রাখেন।

> আল্লাহ বলেন, “স্মরণ করো, যখন তিনি তাঁর পক্ষ থেকে স্বস্তির জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন এবং আকাশ থেকে তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন যাতে এর মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করেন, আর তোমাদের থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর করেন, তোমাদের হৃদয়সমূহ দৃঢ় রাখেন এবং এর মাধ্যমে তোমাদের পা-সমূহ স্থির রাখেন। স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ফিরিশতাদের প্রতি ওহি প্রেরণ করেন যে, ‘নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, সুতরাং তোমরা মুমিনদেরকে অবিচলিত রাখ’। যারা কুফরি করেছে অচিরেই আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করব; কাজেই তোমরা আঘাত করো তাদের ঘাড়ের উপরে এবং আঘাত করো তাদের প্রত্যেক আঙ্গুলের অগ্রভাগে এবং জোড়ে।” *[সূরা আল-আনফাল: ১১-১২]*

> আরো বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কোনো দলের সম্মুখীন হবে তখন অবিচলিত থাক এবং আল্লাহকে বেশি পরিমাণ স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।" *[সূরা আল-আনফাল: ৪৫]*

> আরো বলেন, 'যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদেরকে সুদৃঢ় বাক্যের দ্বারা দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং যারা যালিম আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন। আর আল্লাহ যা ইচ্ছে তা করেন।" *[সূরা ইবরাহীম: ২৭]*

> আরো বলেন, "আর আমরা আপনাকে অবিচলিত না রাখলে আপনি অবশ্যই তাদের দিকে প্রায় কিছুটা ঝুঁকে পড়তেন।" *[সূরা আল-ইসরা: ৭৪]*

> আরো বলেন, "হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা-সমূহ সুদৃঢ় করবেন।" *[সূরা মুহাম্মাদ: ০৭]*

সুতরাং হকের ওপর দৃঢ়পদ থাকা গোঁড়ামি নয়। এটাকে গোঁড়ামি বলে নিন্দা করা যাবে না।

গোঁড়ামি হচ্ছে, কারো কথা, মত বা ব্যক্তির ভুল কিংবা শুদ্ধ সেটা যাচাই না করেই তার বা তার মতের অন্যায় পক্ষাবলম্বন করা।

❑ গোঁড়ামি কয়েক প্রকার হতে পারে:

১. কারো মত ও কোনো ব্যক্তির জন্য গোঁড়ামি করা। এ ব্যাপারে সাধারণত ইলমের দিকে সম্পৃক্ত অর্ধ আলিম লোকেরাই বেশি নিমজ্জিত। তারা তাদের উস্তাদ কিংবা মতাদর্শের জন্য গোঁড়ামি করে থাকে। এ গোঁড়ামি প্রতিষ্ঠা করার জন্য কিছু মাদ্রাসা ও খানকাও তৈরি হয়ে যায়।

২. জাতি, বংশীয় কিংবা গোত্রীয় গোঁড়ামি। রাসূলের যুগে এক মুহাজির ও আরেক আনসার এ গোঁড়ামির ডাক দেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন,

> 'জাহিলি আহ্বান কোত্থেকে শুনলাম, অথচ আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান। ওসব ছেড়ে দাও, তা অতি দুর্গন্ধময়'। *[মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ২৫৮৪]*

আনসার ও মুহাজির নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় শব্দ। কিন্তু ব্যবহার হয়েছে গোঁড়ামিতে, তাই তা নিষিদ্ধ হয়েছে।

৩. দলীয় গোঁড়ামি। বর্তমানে যাতে অধিকাংশ মুসলিমরা জড়িত। অথচ এ রকম দলীয় গোঁড়ামি ইসলামে নেই। কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূলকে অনুসরণে সুদৃঢ় থাকতে পারে। কিন্তু কোনো নেতা কিংবা ব্যক্তি বিশেষের জন্য এমন গোঁড়ামি কোনোভাবেই অনুমোদিত হতে পারে না।

৪. সাংগঠনিক গোঁড়ামি। এটাও বর্তমান সময়ে কোনোভাবেই কম নয়। এটার কারণে ভিন্ন মতের লোককে গালিগালাজ, মিথ্যাচার, অপমান, জান ও মালের ক্ষতি করার মতো সবই করা হয়। নাউযুবিল্লাহ।

৫. ধর্মীয় গোঁড়ামি। যার কারণে কাউকে জোর করে নিজের মতবাদে যেতে বাধ্য করা হয়।

> আল্লাহ বলেন, "দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই; সত্য পথ সুস্পষ্ট হয়েছে ভ্রান্ত পথ থেকে। অতএব, যে তাগূতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে সে এমন এক দৃঢ়তর রজ্জু ধারণ করল যা কখনো ভাঙ্গাবে না। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।" *[সূরা আল-বাকারাহ: ২৫৬]*

৬. চিন্তাগত গোঁড়ামি। অথচ ইসলাম তা করতে নিষেধ করে মানুষদেরকে মধ্যপন্থি করেছে।

> আল্লাহ বলেন, "আর এভাবে আমরা তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থি জাতিতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির ওপর সাক্ষী হও এবং রাসূল তোমাদের ওপর সাক্ষী হতে পারেন। আর আপনি এ যাবৎ যে কিবলা অনুসরণ করছিলেন সেটাকে আমরা এ উদ্দেশ্যে কিবলায় পরিণত করেছিলাম যাতে প্রকাশ করে দিতে পারি কে রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে পিছনে ফিরে যায়? আল্লাহ যাদেরকে হিদায়াত করেছেন তারা ছাড়া অন্যদের ওপর এটা নিশ্চিত কঠিন। আল্লাহ এরূপ নন যে, তোমাদের ঈমানকে ব্যর্থ করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি

> সহানুভূতিশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা আল-বাকারাহ: ১৪৩]

৭. শ্রেণি গোঁড়ামি। যেমন নারীদের জন্য কিংবা পুরুষদের জন্য, যেমন কিছু মানুষ ফেমিনিস্ট হয়ে আছে। এগুলোও জাহিলিয়াত।

৮. খেলাধুলা সংক্রান্ত গোঁড়ামি। এ আরেক জগৎ। এর কারণে অনেকে জীবন দিয়ে দিচ্ছে, অপরকে মেরে ফেলছে। এটাও জাহিলিয়াত।

৯. উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের গোঁড়ামি, যার ফলে অনেকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ইসলাম গ্রহণ থেকে দূরে থাকতো।

> আল্লাহ বলেন, "আর তারা বলে, এ কুরআন কেন নাযিল করা হলো না দুই জনপদের কোনো মহান ব্যক্তির ওপর?" [সূরা আয-যুখরুফ: ৩১]

> আল্লাহ তাআলা তার জবাবে বলেন, "তারা কি আপনার রবের রহমত বণ্টন করে? আমরাই দুনিয়ার জীবনে তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করি এবং তাদের একজনকে অন্যের ওপর মর্যাদায় উন্নত করি যাতে একে অন্যের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে; আর আপনার রবের রহমত তারা যা জমা করে তা থেকে উৎকৃষ্টতর।" [সূরা আয-যুখরুফ: ৩২]

১০. পারিবারিক গোঁড়ামি। যা মানুষকে সঠিকভাবে জানতে ও কাজ করতে অনেকসময় বাধাগ্রস্ত করে।

১১. রাজনৈতিক গোঁড়ামি। যার মাধ্যমে শাসকরা তাদের ভালো কিংবা মন্দ সবকিছু মানতে জনগণকে বাধ্য করে।

❑ গোঁড়ামির বড়ো সমস্যা হচ্ছে,

১. মুসলিম ঐক্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বরং বিনষ্ট করে।

> "আর তোমরা সকলে আল্লাহর রশি দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো, তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে।

> তোমরা তো অগ্নিগর্তের দ্বারপ্রান্তে ছিলে, তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা হিদায়াত পেতে পারো।" [সূরা আলে ইমরান: ১০৩]

২. গোঁড়ামির মাধ্যমে হিংসা-বিদ্বেষ চালু হয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> 'আরব উপদ্বীপে কেউ তার ইবাদাত করবে' এ বিষয়ে শয়তান নিরাশ হয়ে পড়েছে, তবে সে তাদেরকে একজনের বিরুদ্ধে অপরজনকে লাগিয়ে রাখবে।' মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ২৮১২।

৩. গোঁড়ামির আরেকটি খারাপ দিক হচ্ছে এর মাধ্যমে এক গোষ্ঠী বা দেশের লোক অন্য গোষ্ঠী বা দেশের লোককে অপমানিত করে থাকে। এজন্য সালমান আল-ফারিসি (رضي الله عنه) বলেন, 'পবিত্র ভূমি কাউকে পবিত্র করে না, মানুষকে তার আমলই কেবল নিষ্কলুষ করতে পারে।' [মুওয়াত্তা মালিক, হা. ৭]

৪. গোঁড়ামির আরেকটি খারাপ দিক হচ্ছে, তা মানুষকে ইনসাফ করতে দেয় না। ফলে যালিম বা মাযলুম হতে হয়। অনেক সময় এ কারণে যোগ্য কাউকে কর্মে নিয়োগ করে না, অযোগ্যকে নিয়োগ দেওয়া হয়।

> আল্লাহ বলেন, "হে মুমিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে; কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা তোমাদেরকে যেন সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করবে, এটা তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো। নিশ্চয় তোমরা যা করো, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।" [আল-মায়িদাহ: ০৮]

অনুরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> 'যে-কেউ এমন ঝান্ডার নিচে অবস্থান করে মারা যাবে যার লক্ষ্য অস্পষ্ট, যারা মানুষদেরকে গোঁড়ামি কিংবা গোঁড়ামির সাহায্য করার আহ্বান করে, তার মৃত্যু জাহিলিয়াতের হবে।' [মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ৩৪৪০]

ইমাম আহমাদ ﷺ বলেন, সেটা হচ্ছে, অন্ধকার কোনো কাজ, যেখানে লক্ষ্য স্পষ্ট নয়, কারণ অজানা। যেখানে মানুষ প্রবৃত্তির টানে যুদ্ধ করে, শরীআতের চাহিদায় নয়। *দেখুন, আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযি, কাশফুল মুশকিল মিন হাদীসিস সহীহাইন (২/৫১)।*

৫. গোঁড়ামির আরেক খারাপ দিক হচ্ছে, হক দেখতে না পাওয়া ও হক অস্বীকার করা। যখন কারো নাম-ডাক হয়ে যায়, তখন তার পক্ষে অন্যের হক কথা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে তার নজির অনেক বেশি।

৬. গোঁড়ামির আরেক খারাপ দিক হচ্ছে, ভুল সংশোধন না করা। হয়ত তিনি একটি মত গ্রহণ করেছেন, কিছু দিন পরে দেখলেন যে, ভিন্নমতটি বেশি শক্তিশালী, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে আর পারলেন না।

৭. গোঁড়ামির কারণে অনেক সময় মানুষ বাস্তব বিষয়কে অন্য রকম করে পেশ করে, কখনো কখনো হককে মিথ্যা হিসেবে প্রকাশ করে।

৮. গোঁড়ামি মানুষদেরকে ঝগড়া বিবাদ, হানাহানিতে নিবদ্ধ করে।

৯. গোঁড়ামি মানুষকে প্রবৃত্তিপূজারী বানিয়ে দেয়।

১০. গোঁড়ামির আরেকটি দিক হলো, তার কারণ হচ্ছে মূর্খতা, কিন্তু যিনি গোঁড়ামি করছেন তিনি তা বুঝতে পারেন না।

❑ ইসলামে তাআসসুব বা গোঁড়ামির বিধান:

তাআসসুব বা গোঁড়ামি ইসলামে কোনোভাবেই অনুমোদিত নয়।

> আল্লাহ তাআলা বলেন, "যারা মনোযোগের সঙ্গে কথা শোনে এবং তার মধ্যে যা উত্তম তা অনুসরণ করে। তাদেরকেই আল্লাহ হিদায়াত দান করেছেন আর তারাই বোধশক্তি সম্পন্ন।" *[সূরা আয-যুমার: ১৮]*
>
> আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, "হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, আর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অন্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই বেশি মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে বেশি তাকওয়াসম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।" *[সূরা আল-হুজুরাত: ১৩]*
>
> আরো বলেন, "আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে তার প্রবৃত্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি আপনি তার জিম্মাদার হবেন?" *[সূরা আল-ফুরকান: ৪৩]*

টীকা-১৮

❑ আকীদাহ ও ইজতিহাদি মাসআলার ক্ষেত্রে অকাট্যতা:

অধিকাংশ ইজতিহাদি মাসআলায় অকাট্য কথা বলতে কিছু থাকে না। কিন্তু আকীদাহ'র মাসআলায় এ বক্তব্য চলবে না। শুধু ইজতিহাদি মাসআলায় এটি একটি সঠিক মত, যা ইমাম শাফিয়ি ﷺ বলেছিলেন। প্রত্যেকেই তার ইজতিহাদ অনুসারে আমল করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও এমনটি বলেছেন,

> "তোমরা আমার কাছে ঝগড়া করো, তোমাদের কারো প্রমাণ অপরের চেয়ে বেশি চিত্তাকর্ষক হয়, ফলে তার পক্ষে আমার শোনা অনুযায়ী ফয়সালা দেই, তবে যার জন্য তার ভাইয়ের হক আমি কর্তন করি, সে যেন তা না নেয়; কারণ আমি তো জাহান্নামের টুকরোই শুধু কর্তন করছি।" *[বুখারি, হা. ২৪৫৮; মুসলিম, হা. ১৭১৩]*

সুফইয়ান আস-সাওরি ﷺ বলেন, 'যখন তুমি দেখবে যে, একটি লোক তোমার বিপরীত মতে আমল করছে, আর সেখানে পূর্ব থেকেই মতভেদ চলে আসছে, তাহলে তুমি তাকে নিষেধ করো না।' *[ফাতহুল বার বি তারতীবে আত-তামহীদ লি ইবন আবদিল বার (৪/৫৪৮)]*

ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-কাত্তান ﷺ বলেন, সর্বদা মুফতিদের প্রশ্ন করা হতো, মুফতিগণের একজন যা হালাল বলতো আরেকজন তা হারাম বলতো, তাদের মধ্যে একে অপরকে ধ্বংস হয়ে গেছে বলতো না। [জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি (২/১৬১)]

ইউনুস আস-সাদাফি ﷺ বলেন, "আমি শাফিয়ি থেকে বুদ্ধিমান মানুষ কাউকে দেখি না। তার সঙ্গে এক মাসআলায় মুনাযারা করে আমরা আলাদা হলাম, তারপর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে আমার হাত ধরে বললেন, 'আবু মূসা! একটি মাসআলায় আমরা একমত না হতে পারলেও আমরা কি ভাই হিসেবে থাকতে পারি না?' ইমাম যাহাবি এর ওপর টীকা দিয়ে বলেন, এটা প্রমাণ করে ইমাম শাফিয়ির বিবেকের পরিপূর্ণতা ও তাঁর ফিকহের উৎকর্ষতার; কারণ আলিমগণ মতভেদ সর্বদাই করেছেন।" [ইমাম যাহাবি, সিয়ারু আলামিন নুবালা (১০/১৬)]

আমাশ বলেন, আমি আমাদের যির ও আবু ওয়ায়িল সহ উস্তাদগণকে পেয়েছি, তাদের মধ্যে কেউ উসমানকে আলির চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন, আবার কেউ আলিকে উসমানের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন, তারপরও তারা পরস্পর ভালোবাসা ও সম্প্রীতিতে অনেক শক্ত ছিলেন।' [ইমাম যাহাবি, সিয়ারু আলামিন নুবালা (৪/১৬৯)]

ইবন আবদিল বার ﷺ কোনো কোনো সালাফ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'যে-কেউ মতভেদ শুনতে পারে না, সে আলিম হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয়নি।' [জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি (২/১০২)]

ইবন তাইমিয়্যাহ ﷺ এ বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি আলাদা গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার নাম 'রাফউল মালাম আনিল আয়িম্মাতিল আলাম।'। সুতরাং মতভেদের বিষয়টিকে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখা উচিত। আরো দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ ফাতাওয়া (২০/২৫৭)।

ইবন হাজার ﷺ বলেন, 'ইমামগণ কর্তৃক হাদীসের কারণ বের করা অধিক ধারণার ওপর নির্ভরশীল'। *[ফাতহুল বারী, (১/৫৮৫)]* তার অর্থ হচ্ছে, অকাট্য নয় এমন জায়গায় মতভেদ হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

৮. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

"

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, নিছক মতবিরোধের কারণে শত্রুতা পোষণ করা, অথচ তারা (সালাফরা) এই বিষয়কে সম্মান করতেন, কোনো ব্যক্তির অবস্থা এবং সমস্যার বাস্তবতার ওপর নির্ভর করে। তারা ইখলাসের সঙ্গে মতবিরোধ করতেন, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ক্ষতির জন্য নয়।[১৯]

"

টীকা-১৯

❑ মতবিরোধ কতটুকু গ্রহণযোগ্য?

মতবিরোধ একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। দুনিয়ার বুকে যেদিন আদম এসেছেন, তারপরই তার দুসন্তান মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। সকল মতবিরোধ গ্রহণযোগ্য নয়।

» যেসব স্থানে মতবিরোধ গ্রহণ করা হয় না, তা হচ্ছে:

১. ঈমান ও তার রুকনের বিষয়ে।

২. ইসলাম ও তার রুকনের বিষয়ে।

৩. হালাল ও হারামের স্পষ্ট থাকার জায়গায়।

৪. যেসব মাসআলায় ইজমা হয়েছে।

৫. যেসব বিষয় অত্যাবশ্যকভাবে দীনের অংশ বলে সকলের কাছে জানা রয়েছে। এগুলোতে মতভেদ গ্রহণযোগ্য নয়।

» যে সকল জায়গায় মতবিরোধ গ্রহণযোগ্য তা হচ্ছে:

১. ফিকহি কোনো মাসআলায় কুরআন ও সুন্নাহর সরাসরি ভাষ্য না থাকা।

২. এ বিষয়ে হাদীসের ভাষ্য রয়েছে কিন্তু ভাষ্যটি তাদের কারো কাছে না পৌঁছা।

৩. এ বিষয়ে হাদীস তার কাছে পৌঁছেছে কিন্তু তিনি হাদীসটিকে দুর্বল বলে বিশ্বাস করতেন।

৪. এ বিষয়ে হাদীস তার কাছে পৌঁছেছে কিন্তু হাদীসটি তার কাছে গ্রহণ করার বিশেষ শর্ত পূরণ করেনি।

৫. এ বিষয়ে হাদীস তার কাছে পৌঁছেছিল কিন্তু তিনি তা ভুলে গিয়েছিলেন।

৬. এ বিষয়ে ভাষ্য পৌঁছেছে, কিন্তু ভাষ্যটিতে কী বোঝানো হয়েছে এটা তার কাছে স্পষ্ট হয়নি।

৭. ভাষ্যটিতে যা বোঝানো হয়েছে বলে অন্যজন বলেছে তা অপর কোনো আলিমের কাছে বিশ্বাস হয়নি।

৮. ভাষ্যটির বিপরীত অন্য কোনো ভাষ্য আছে বলে তার বিশ্বাস ছিল।

৯. ভাষ্যটি অন্য হাদীসের বিপরীত হয়েছে এটাই তার বিশ্বাস ছিল।

১০. ভাষ্যটির বিপরীতে এমন কিছু এসেছে যার কারণে তার কাছে মনে হয়েছে যে হাদীসটি দুর্বল বা রহিত। *[ইবন তাইমিয়্যাহ, রাফউল মালাম আনিল আয়িম্মাতিল আলাম]*

এসব কারণ ও অনুরূপ কারণে হয়তো কেউ কোনো দলীলের ওপর আমল করেননি, তাই তার সঙ্গে শত্রুতা কিংবা তার চরিত্র হননে নেমে যাওয়া কখনো সালাফগণের কাজ নয়।

এ জাতীয় মতবিরোধ এখনও হতে পারে, কারণ কোনো দলীলের চাহিদা সকলের কাছে সমানভাবে প্রতিভাত হয় না। আমাদের শাইখ আবদুল আযীয ইবন বায ও শাইখ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানির মাঝে এরকম বহু মাসআলায় মতভেদ ছিল। উভয়ের মাঝে এ ব্যাপারে আলোচনাও হতো, কিন্তু তাই বলে ভালোবাসার কমতি ছিল না।

আমাদের শাইখ আবদুল মুহসিন আল-আব্বাদ ﷾ ও শাইখ আলবানি ﷺ এ রকম বেশ কিছু বিষয়ে মতভেদ করেছেন, কিন্তু শাইখ আবদুল মুহসিন আল-আব্বাদকে শাইখ আলবানির সম্মান ছাড়া কথা বলতে দেখিনি।

৯. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

“

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, দীনকে একটি নির্দিষ্ট মাসআলায় সীমাবদ্ধ করা, যাতে করে যে আমার সাথে একমত হবে সে সালাফি আর যে আমার সাথে মতবিরোধ করবে সে সালাফি নয়। অথচ 'সালাফি' একটি মানহাজ; কেবল একটি মতের অভিব্যক্তি নয়।[২০]

”

টীকা-২০.

অবশ্যই এটা বলা যাবে যে, আকীদাহ-বিশ্বাস ও মানহাজে যেসব বিষয়ে মতভেদ করার সুযোগ নেই, সেসব বিষয়ে কারো সঙ্গে ঐক্য হলে তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত, সালাফি মতাদর্শের অনুসারী। কিন্তু এর মধ্যকার কোনো একটিতে একমত হলেই তিনি সঠিক হয়ে যাবেন এমন কোনো বিষয় নির্ধারণ করে সেটার ভিত্তিতে সম্পর্ক রক্ষা করা বা না করা নির্ভর করবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত মৌলিক আকীদাহ ও মানহাজের সব বিষয়ে এক না হচ্ছেন ততক্ষণ বলার সুযোগ থাকবে যে, তিনি আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী নন। এ হচ্ছে আকীদাহ ও মানহাজের ব্যাপারে নীতি।

আর যদি মাসআলাটি ইজতিহাদি বিষয় হয়, আর তা মতভেদপূর্ণ হয় তবে জানা দরকার যে, এ রকম বহু মাসআলাতে সালাফগণ তথা সাহাবায়ে কিরাম, তাবিয়িগণ মতভেদ করেছেন। কিন্তু কেউ যেন এর মধ্য হতে একক কোনো মাসআলা নিয়ে এসে সেটা দিয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতে অনুসারী কিনা তা পরীক্ষা করতে না নেমে যায়। যেমন, কেউ রাফউল ইয়াদাইন করল কি না? কেউ আমীন জোরে বলল কি না? বা কেউ বুকুর পরে হাত বাঁধলো বা ছাড়লো কি না, তার ওপর সালাফি হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করবে না। তবে যদি কেউ এমন কোনো আমল করে যা বিদআতিদের চিহ্ন তখন তার অবস্থা, পরিবেশ, কারণ ইত্যাদি জানার পর কেবল তার ব্যাপারে সালাফি হওয়া বা না হওয়া নির্ধারণ করে বলা যাবে।

১০. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

“

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, অন্ধ তাকলীদ করা[২১] ও দলীল ছাড়া গোঁড়ামি করা।

”

টীকা-২১

তাকলীদ কাকে বলে, তাকলীদের উৎপত্তি কীভাবে হলো, এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

❑ তাকলীদ পরিচিতি:

আরবি অভিধানে তাকলীদ শব্দটির অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুর ওপর অন্য কোনো কিছুকে লটকানো। *[ইবন ফারিস, মু'জামু মাকায়ীসিল লুগাহ (৫/১৯)]* এর থেকেই এসেছে উটের গলায় হার বা জুতা লটকিয়ে তাকে বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা। তাছাড়া তাকলীদ-এর আরেকটি অর্থ হচ্ছে, লুযূম বা সর্বদা লেগে থাকা। যেমন: বলা হয়, কাল্লিদুল খাইলা অর্থাৎ সর্বদা তার সঙ্গে থাক। অপর অর্থটি হচ্ছে, বহন করা। যেমন বলা হয়, 'কাল্লাদতুহু আমরি'। মোটামুটি এ তিনটি অর্থই আরবি অভিধানে এসেছে। *[ইবন মানযূর, লিসানুল আরাব (১১/২৭৬)]*

পরিভাষায় তাকলীদ শব্দটির বহু সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তবে এ মতভেদের কারণ হচ্ছে, আলিমগণ তাকলীদ নিয়ে দুটি অবস্থানে:

এক. কারো কারো মতে তাকলীদ তখনই বলা হবে যখন এমন কারো কথা গ্রহণ করা হবে যার কথা স্বয়ং প্রমাণ নয়: যেমন,

আসফারায়ীনি বলেন, 'কোনো বক্তার বক্তব্য বিনা দলীলে মেনে নেওয়ার নাম তাকলীদ।' *[যারকাশি, আল-বাহরুল মুহীত (৬/২০৭)]* এ সংজ্ঞা আরো দিয়েছেন জুওয়াইনি *[আল-ওরাকাত: ৮২]* আবু মানসূর আল-বাগদাদি, তবে তিনি বাড়িয়েছেন, 'যার কথার ওপর প্রমাণ প্রকাশ পায় না।' *[আল-বাহরুল মুহীত (৬/২৭০)]*

বাকিল্লানি বলেন, তা হচ্ছে, এমন কারো অনুসরণ করা যার অনুসরণের ওপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি, আর তিনি কোনো জ্ঞানের দিকে সম্পৃক্ত করেননি। *[আল-বাহরুল মুহীত (৬/২৭৪)]* জুওয়াইনি তার 'আত-তালখীস' গ্রন্থে এটাকে সমর্থন দিয়েছেন *(৩/৪২৫)*।

শীরাযি বলেন, তা হচ্ছে- কারো কথা প্রমাণ ছাড়া গ্রহণ করা। *[আল-লুমা ১২৫]* আর এ সংজ্ঞাটি আবু ইয়ালা *[আল-উদ্দাহ (৪/১২১৬)]*, ইবন তাইমিয়্যাহ *[আল-*

মুসাওয়াদাহ ৪৬২], ইবন জুযাই *[তাকরীবুল উসূল ৪৪৪]* ও উকবারি *[রিসালাতুন ফী উসূলিল ফিকহ, পৃ. ১২৭]* গ্রহণ করেছেন।

একই নীতিতে চলেছেন অনেক হানাফি *[ইবনুস সাআতি, নিহায়াতুল উসূল (২/৬৮৯); জুরজানি, আত-তা'রীফাত ৯০; ইবনুল হুমাম, আত-তাহরীর ও তার ব্যাখ্যাকারীরা যেমন আত-তাকরীর ওয়াত তাহবীর (৩/৩৪০); তাইসীরুত তাহরীর (৪/২৪১), ইবন আবদুশ শাকুর, মুসাল্লামুস সুবূত (২/৪০০)]*

অনুরূপ অনেক মালিকি *[বাজি, আল-হুদূদ ৬৪; ইবনুল হাজিব, মুখতাসারুল মুন্তাহা (৩/৩৫০); কারাফি, নাফায়িসুল উসূল (৯/৩৯৫২-৩৯৫৩)]*

অনুরূপ অনেক শাফিয়ি *[সামআনি, কাওয়াতিউল আদিল্লাহ (২/৩৪০); গাযালি, আল-মুস্তাসফা (২/৩৮৭); ইবনুস সালাহ, আদাবুল ফাতাওয়া ১৩৫; আস-সফী আল-হিন্দি, নিহায়াতুল উসূল (৪/৩৯২৫); ইসনাওয়ি, যাওয়ায়িদুল উসূল ৪৩৯; ইবনুস সুবুকি, জামউল জাওয়ামি'উ (৪/৬০০); সুয়ূতি, রিসালাতু উসূলিল ফিকহ ৭৭; আল-আনসারি, লুব্বুল উসূল ১৫০]*

এবং অনেক হাম্বলি ইমাম *[আবুল খাত্তাব, আত-তামহীদ (৪/৩৯৫); ইবন কুদামাহ, রাওদাতুন নাযির (৩/১০১৭); ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-মুসাওয়াদাহ ৫৫৩; তুফি, শারহু মুখতাসার আর-রাওদাহ (৩/৬৫১); ইবনুন নাজ্জার, শারহুল কাওকাবুল মুনীর (৪/৫২৯-৫৩০)]*

সামআনি বলেন, এ হচ্ছে ফকীহগণের সংজ্ঞা। *[কাওয়াতিউল আদিল্লাহ (২/৩৪০)]*

আর এর ওপর চলেছেন ইবন হাযম, *[আল-ইহকাম (২/২৩৩)]* শাওকানি *[ইরশাদুল ফুহূল ৪৪৩]*, সিদ্দীক হাসান খান *[হুসূলুল মামূল ১৩৬]*।

দুই. কারো কারো মতে তাকলীদ তখনই বলা হবে যখন এমন কারো অনুসরণ করা যার কথা স্বয়ং প্রমাণ। যেমন,

কাফফাল আশ-শাশি বলেন, তাকলীদ হচ্ছে বক্তার বক্তব্য গ্রহণ করে নেওয়া, যদিও জানা না যায়, তিনি তা কোত্থেকে বলেছেন। *[আল-বাহরুল মুহীত (৬/২৭০); সালাসিলুয যাহাব ৪৩৯-৪৪০; বুরহান (২/৮৮৮)]*

নাসাফি বলেন, তাকলীদ হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অপর কারো থেকে শুনেই তার অনুসরণ করা এই ভিত্তিতে যে, সে হক বলেছে, যাতে দলীল দেখা

কিংবা চিন্তা করা হয় না। *[কাশফুল আসরার (২/১৭২-১৭৩)]* জুরজানিও এমন একটি সংজ্ঞাই দিয়েছে। *[আত-তা'রীফাত, পৃ. ৯০]*

তবে সবচেয়ে উপযোগী সংজ্ঞা হচ্ছে, এমন কারো 'মাযহাব' এর সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করে নেওয়া যার কথা স্বয়ং দলীল নয়।

❑ তাকলীদের ব্যাপারে মৌলিক নীতি:

সর্বশেষ সংজ্ঞার ওপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে, মৌলিকভাবে ইসলামে তাকলীদ জায়িয নেই। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা বহু আয়াতে তাকলীদ নিষেধ করেছেন। যেমন,

> "তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যা নাযিল করা হয়েছে, তোমরা তার অনুসরণ করো এবং তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবকরূপে অনুসরণ করো না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করো।" *[সূরা আল-আ'রাফ: ০৩]*

তাছাড়া তাকলীদ পূর্ববর্তী উম্মাতদের কুফর ও শির্কে পতিত হওয়ার কারণ,

> আল্লাহ বলেন "আর যারা কুফরি করেছে তারা বলে, 'আমরা এ কুরআনের ওপর কখনো ঈমান আনব না এবং এর আগে যা আছে তাতেও না।' আর হায়! আপনি যদি দেখতেন যালিমদেরকে, যখন তাদের রবের সামনে দাঁড় করানো হবে, তখন তারা পরস্পর বাদ-প্রতিবাদ করতে থাকবে, যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো, তারা অহংকারীদেরকে বলবে, 'তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মুমিন হতাম।' যারা অহংকারী ছিল তারা, যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের কাছে সৎ পথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে তা থেকে নিবৃত্ত করেছিলাম? বরং তোমরাই ছিলে অপরাধী'।" *[সূরা সাবা: ৩১-৩২]*
>
> অনুরূপ "আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা তোমরা অনুসরণ করো', তারা বলে, 'না, বরং আমরা অনুসরণ করব তার, যার ওপর আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি'। যদিও তাদের

> পিতৃপুরুষরা কিছু বুঝতো না এবং তারা সৎপথেও পরিচালিত ছিল না, তবুও কি?" [সূরা আল-বাকারাহ: ১৭০]

> আরো বলেন, "আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার দিকে ও রাসূলের দিকে আস', তখন তারা বলে, 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যেটাতে পেয়েছি সেটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।' যদিও তাদের পূর্বপুরুষরা কিছুই জানতো না এবং সৎ পথপ্রাপ্তও ছিল না, তবুও কি?" [সূরা আল-মায়িদাহ: ১০৪]

> আরো এসেছে, "তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে তাদের রব রূপে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়াম-পুত্র মসীহকেও। অথচ এক ইলাহের ইবাদাত করার জন্যই তারা আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই। তারা যে শরীক করে তা থেকে তিনি কতই না পবিত্র!" [সূরা আত-তাওবাহ: ৩১]

এজন্যই প্রত্যেক ইমাম তাকলীদ থেকে নিষেধ করে গেছেন। বিষয়টি ইমাম আবু হানীফা, মালিক, শাফিয়ি ও আহমাদ ইবন হাম্বল থেকে সাব্যস্ত। দেখুন: ফুল্লানি, ঈকাযুল হিমাম; আলবানি, মুকাদ্দিমাতু সিফাতিস সালাত।

❑ তাকলীদের প্রকারাদি ও প্রত্যেক প্রকারের বিধান:

» তাকলীদ দুপ্রকার:

এক. অনুমোদিত তাকলীদ: আর তা কয়েক অবস্থায়,

১. সময় ও সুযোগ না থাকার কারণে কোনো আলিমের কথার ওপর নির্ভর করে আমল করা।

২. যোগ্যতা না থাকার কারণে কোনো আলিমের অনুসরণ করা। যেমন,

> আল্লাহ বলেন, "আর আপনার আগে আমরা ওহিসহ পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম। সুতরাং যদি তোমরা না জানো, তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করো।" [সূরা আল-আম্বিয়া: ০৭]

দুই. নিন্দিত তাকলীদ: আর তা হচ্ছে,

১. কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্য স্পষ্ট হওয়ার পরও তার বিরোধিতা করে কারো অনুসরণ করা।

> আল্লাহ বলেন, "আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ের ফয়সালা দিলে কোনো মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর জন্য সে বিষয়ে তাদের কোনো (ভিন্ন সিদ্ধান্তের) ইখতিয়ার সংগত নয়। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল, সে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হলো।" [সূরা আল-আহযাব: ৩৬]

২. সুযোগ ও সামর্থ্য থাকার পরও কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্ধভাবে কারো তাকলীদের পিছনে পড়ে থাকা। যেমন আল্লাহ বলেন,

> "আর স্মরণ করুন, যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ অথচ তোমরা জানো যে, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রাসূল। অতঃপর তারা যখন বাঁকা পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বাঁকা করে দিলেন। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।" [সূরা আস-সাফফ: ০৫]

> আরো বলেন, "একদলকে তিনি হিদায়াত করেছেন। আর অপরদল, তাদের ওপর পথভ্রান্তি নির্ধারিত হয়েছে। নিশ্চয় তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে তাদের অভিভাবক-রূপে গ্রহণ করেছিল এবং মনে করত তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।" [সূরা আল-আরাফ: ৩০]

৩. তাকলীদ বাধ্যতামূলক মনে করে কুরআন ও সুন্নাহর দলীল বোঝার চেষ্টা না করা।

৪. গোঁড়ামি করে কারো কোনো এক ব্যক্তির সকল কথাকে বাধ্যতামূলক মনে করে, তা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা।

> আল্লাহ বলেন, "যালিম ব্যক্তি সেদিন নিজের দুহাত কামড়াতে কামড়াতে বলবে, হায়! আমি যদি রাসূলের সঙ্গে কোনো পথ অবলম্বন করতাম!" [সূরা আল-ফুরকান: ২৭]

> আরো বলেন, "যেদিন তাদের মুখমণ্ডল আগুনে উলট-পালট করা হবে, সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহকে মানতাম আর রাসূলকে মানতাম!" *[সূরা আল-আহযাব: ৬৬]*

> আরো বলেন, "যখন যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা, যারা অনুসরণ করেছে তাদের থেকে নিজেদের মুক্ত করে নেবে এবং তারা শাস্তি দেখতে পাবে। আর তাদের পারস্পরিক সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।" *[সূরা আল-বাকারাহ: ১৬৬]*

তবে কোনো অবস্থাতেই বাতিলপন্থি ও বিদআতিদের বিদআত জানার পর কারো জন্য তাদের অনুসরণ-অনুকরণ করা জায়িয নেই। কারণ তাহলে দীন আর আল্লাহর থাকবে না, ব্যক্তিবিশেষের হয়ে যাবে। দেখুন, ইবনুল কাইয়িম, তারীকুল হিজরাতাইন, পৃ. ৬০৭। কারণ তখন সেটা সে হাদীসের অধীন হবে যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> "যে-কেউ ইসলামে বাজে কোনো কাজ করবে তার গুনাহ যেমন তার ওপর হবে তেমনি যত মানুষ তার অনুসরণ করবে সবার গুনাহ সে কাঁধে নিবে।" *[মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ১০১৭]*

১১. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

"এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবিগণের নিন্দা বা সমালোচনা করা, এমনকী একজন হলেও।[২২]"

টীকা-২২

গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা। সাহাবায়ে কিরাম বলতে এমন সকল লোকদের বোঝায় যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর জীবদ্দশায় ঈমানের সঙ্গে দেখেছেন, এমনকী যদি সামান্যতম সময়ের জন্যও হয়, আর তারপর ঈমানসহ মারা গেছেন। তাদের প্রশংসায় কুরআন ও হাদীস পরিপূর্ণ। কোনো ঈমানদারের পক্ষে তাদের একজনের সমালোচনাও বৈধ নয়।

❑ **আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদাহ হচ্ছে,**

১) সাহাবায়ে কিরামকে নিষ্পাপ/নির্ভুল বলা যাবে না।

২) নির্ধারণ করে একজনকে সমালোচনার জন্য গ্রহণ করা যাবে না।

৩) হাদীসের ভাষ্যে যতটুকু এসেছে, ততটুকুতে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।

৪) সাহাবায়ে কিরামের সকলকেই জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত মনে করতে হবে। কারো সুসংবাদ নির্ধারণ করে, আর কারো সুসংবাদ অনির্ধারিত ও ব্যাপকভাবে প্রদান করতে হবে।

৫) সাহাবায়ে কিরামের সমালোচনাকারী পথভ্রষ্ট। তাদের থেকে দীনের ইলম নেওয়া যাবে না।

৬) সাহাবায়ে কিরামের সকলের জন্য অন্তরে ভালোবাসা রাখতে হবে।

৭) সাহাবায়ে কিরামের কারো বিরুদ্ধে অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করে রাখা যাবে না।

৮) সাহাবায়ে কিরামের মাঝে সংঘটিত বিবাদগুলোর ব্যাপারে আলোচনা করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৯) সাহাবায়ে কিরামের মাঝে সংঘটিত বিষয়গুলোর অধিকাংশই বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত হয়নি।

১০) সাহাবায়ে কিরামের মাঝে সংঘটিত ঘটনার যেগুলো বিশুদ্ধ সনদে এসেছে সেগুলোতে তাদের ওজর ছিল।

১১) সাহাবায়ে কিরামের প্রশংসা করতে হবে।

১২) সাহাবায়ে কিরামের কারো যদি গুনাহ করার বিষয়টি প্রমাণিত হয়, তবে মনে করতে হবে যে তাদের সেটা ক্ষমা হয়ে গেছে বা তাদের বহু নেক আমলের সাগরে সেটা ডুবে যাবে।

১৩) সাহাবায়ে কিরাম সকলেই ন্যায়পরায়ণ, তারা যা যা বর্ণনা করেছেন সেসব সত্য হিসেবে নিতে হবে।

১৪) সাহাবায়ে কিরামের কাউকে গালি দেওয়া ঈমানে ত্রুটি আসার কারণ।

১৫) সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যারা আয়িশা ﷺ-কে খারাপভাবে চিত্রায়িত করবে, তারা কাফির।

১৬) সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যারা মুআওয়িয়া (মুয়াবিয়া) ﷺ ও তার পিতা-মাতাকে খারাপ কথা বলবে, তারা নিকৃষ্ট লোক।

১৭) সাহাবায়ে কিরামের সকলেই পরবর্তীকালে আসা সকলের চেয়ে উত্তম।

উমার ইবন আবদুল আযীয ﷺ-কে আলি, উসমান, জামাল যুদ্ধ ও সিফফীন যুদ্ধ নিয়ে যা ঘটেছে তা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এগুলো এমন রক্ত যা থেকে আল্লাহ আমার হাতকে বিরত রেখেছেন, আর আমি অপছন্দ করি আমার জিহ্বা তাতে রঞ্জিত করতে।' *[ইবন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা (৫/৩৯৪)]*

হাসান বসরি ﷺ-কে সাহাবায়ে কিরামের মাঝে ঘটে যাওয়া যুদ্ধের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'এগুলো এমন যুদ্ধ যাতে সাহাবায়ে কিরাম উপস্থিত ছিলেন, আমরা অনুপস্থিত ছিলাম; তারা জেনেছেন, আমরা জানতে পারিনি; তারা একমত হয়েছেন, আমরা অনুসরণ করেছি; তারা মতভেদ করেছেন, আমরা থেমে গেছি।' *[কুরতুবি, আল-জামিউ লি আহকামিল কুরআন, তাফসীরে সূরা আল-হুজুরাত: আয়াত ০৯।]*

খিরাশ ইবন হাওশাব ﷺ বলেন, এ উম্মাতের শুরুর দিকের আমরা যাদেরকে পেয়েছি, তাদেরকে এটার ওপর একমতে একথা বলতে পেয়েছি যে, 'তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবিগণের ভালো দিকগুলো বর্ণনা করো, যার মাধ্যমে

তোমাদের অন্তরে মিল-মুহাব্বাত তৈরি হবে; তাদের মাঝে যা ঘটে গেছে তা আলোচনা করো না, যার কারণে তোমাদের মাঝে প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষ মাথাছাড়া দিয়ে উঠবে।' *[খাল্লাল, আস-সুন্নাহ, পৃ. ৫১৩; ইবন আদি, আল-কামিল (৪/৩৪); ইবন আসাকির, তারিখে দিমাশক (২২/২১৫)।]*

হাসান ইবন ইসমাঈল আর রিবঈ ؒ বলেন, আমাকে ইমাম আহমাদ ؒ বলেন, তাবিয়িন, মুসলিম ইমামগণ, সালাফে সালিহীনের আলিমগণ, প্রখ্যাত ফকীহগণের মধ্য হতে নব্বই জনকে এ ব্যাপারে একমত পেয়েছি যে, '... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবিগণের মাঝে ঘটে যাওয়া ব্যাপারে কথা বলা থেকে চুপ থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হচ্ছেন আবু বকর, উমার, উসমান ও আলি, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচাতো ভাই। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সকল সাহাবি, তাঁর সন্তানসন্ততি, স্ত্রী, শ্বশুরালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলের জন্য রহমতের দুআ করতে হবে। এটিই হচ্ছে সুন্নাত, সুতরাং তোমরা সেটাকে বাধ্যতামূলক করে নাও তাহলে নিরাপদ থাকতে পারবে। এটা গ্রহণ করা হিদায়াত, এটা ত্যাগ করা পথভ্রষ্টতা।' *[আবু ইয়ালা, তাবাকাতুল হানাবিলাহ (১/৩৪৯)।]*

আবুল হাসান আল-আশআরি ؒ বলেন, 'আর সালাফে সালিহীন আহলুস সুন্নাহ এ ব্যাপারে একমত হয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে কল্যাণমূলক কথা ছাড়া কিছু বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। তবে তাদের যেসব ভালো আছে কেবল সেগুলোই বর্ণনা করতে হবে। তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য উত্তমপন্থা তালাশ করতে হবে, তাদের ব্যাপারে সর্বোত্তম ধারণা করতে হবে, তাদের ব্যাপারে উত্তম মত প্রকাশ করতে হবে।' *[রিসালাতুন ইলা আহলিস সাগার (১/৩০৩)।]*

আবু বকর আল-জুরজানি আল-ইসমাঈলি ؒ বলেন, 'হাদীসের ইমামগণের বক্তব্য হচ্ছে, ইলম অর্জন করা ও তা তালাশ করার জায়গায় তা তালাশ করতে হবে। কুরআন, তার বিদ্যা ও তাফসীর শিক্ষা গ্রহণে শ্রম দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহসমূহ শোনা, একত্রিত করা ও তাতে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে। সাহাবায়ে কিরামের আসারসমূহ তালাশ করতে হবে। সাহাবায়ে কিরামের সমালোচনা থেকে বিরত থাকতে হবে, তাদের কর্মকাণ্ডের খারাপ

ব্যাখ্যা প্রদান থেকে বাঁচতে হবে, তাদের মাঝে যা ঘটেছে তার ব্যাখ্যা আল্লাহর কাছে সোপর্দ করতে হবে।' *[আবু বকর ইসমাঈলি, ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ, পৃ. ৫৭।]*

ইবন আবি যাইদ আল-কাইরোয়ানি বলেন, 'আহলুস সুন্নাত আরো বিশ্বাস করে যে, সবচেয়ে উত্তম প্রজন্ম হচ্ছে সে প্রজন্ম, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺকে দেখেছে, তাঁর ওপর ঈমান এনেছে, তারপর যারা তাদের পরে এসেছে, তারপর যারা তাদের সঙ্গে লাগোয়া। আর সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে উত্তম হচ্ছে খুলাফায়ে রাশিদা, আবু বকর, উমার, উসমান, আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুম। তারা আরো বিশ্বাস করে যে, সাহাবায়ে কিরামের মাঝে যা ঘটেছে সে ব্যাপারে কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। আর তারাই এমন লোক যাদের জন্য উত্তম ওজর তালাশ করা হবে, তাদের ব্যাপারে উত্তম ধারণা করা হবে।' *[ইবন আবি যাইদ আল-কাইরোয়ানি, রিসালাহ, পৃ. ১৯।]*

এভাবে বর্ণনা করতে থাকলে আমি শত আলিমের বক্তব্য আনতে পারবো, কিন্তু যাদের অন্তরে শীয়াপ্রীতি ঢুকে আছে তাদের কর্ণকুহরে কি তা ঢুকবে?

১২.

এটা সালাফগণের
মানহাজ নয়!

“

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, নিজেকে ফিতনার [২৩] সম্মুখীন করা এবং এতে নিমজ্জিত হওয়া। বরং তারা এটিকে এড়িয়ে চলতেন এবং এর বিরুদ্ধে সতর্ক করতেন। [২৪]

”

টীকা-২৩

ফিতনা শব্দটির অর্থ পরীক্ষা, বিপদাপদ, সমস্যা ইত্যাদি। ফিতনা শব্দের পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে যার মাধ্যমে মানুষের ভালো কিংবা মন্দ অবস্থা প্রকাশ হয়ে পড়ে। *[ইবন মানযূর, লিসানুল আরাব (১০/১৮১)]*

- ফিতনায় পতিত হওয়ার কারণসমূহ:

বিভিন্নভাবে মানুষ ফিতনায় পড়ে, যেমন:

১. সন্দেহে পতিত হওয়ার কারণে ফিতনায় পড়ে: যার পরিণতিতে মানুষ কুফরি কিংবা নিফাকি করে বসে। কারণ সে তখন নিজের মতকে আল্লাহর শরীআতের ওপর প্রাধান্য দেয়।

> আল্লাহ তাআলা বলেন, “এগুলো নামমাত্র, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা রেখেছ, যার সমর্থনে আল্লাহ কোনো দলীল-প্রমাণ নাযিল করেননি। তারা তো অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, অথচ তাদের কাছে তাদের রবের পক্ষ থেকে হিদায়াত এসেছে।” *[সূরা আন-নাজম: ২৩]*

২. প্রবৃত্তির চাহিদার কারণে ফিতনায় পতিত হয়, যার পরিণতিতে মানুষ সুস্থ বিবেকশূন্য হয়ে যায়। তখন সে সুস্থ বিবেকের যুক্তির ওপর প্রবৃত্তির চাহিদাকে প্রাধান্য দেয়।

> আল্লাহ তাআলা বলেন, “তাদের মতো, যারা তোমাদের পূর্বে ছিল। তারা শক্তিতে তোমাদের চেয়ে প্রবল ছিল এবং তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি ছিল তোমাদের চেয়ে বেশি। অতঃপর তারা তাদের ভাগ্যে যা ছিল তা ভোগ করেছে; আর তোমরাও তোমাদের ভাগ্যে যা ছিল তা ভোগ করলে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের ভাগ্যে যা ছিল তা ভোগ করেছে। আর তোমরাও সেরূপ অনর্থক আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত রয়েছ যেরূপ অনর্থক আলাপ-আলোচনায় তারা লিপ্ত ছিল। ওরা তারাই যাদের আমল দুনিয়া ও আখিরাতে নিষ্ফল হয়ে গিয়েছে, আর তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।” *[সূরা আত-তাওবাহ: ৬৯]*

❑ এ জাতীয় ফিতনায় যেসব কারণে মানুষ পতিত হয় তা হচ্ছে,

» সম্পদ ও সন্তানের ফিতনা:

> আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর জেনে রাখ, তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তো এক পরীক্ষা। আর নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁরই কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার।" *[সূরা আল-আনফাল: ২৮]*

> "তোমাদের সম্পদ ও সন্তানসন্ততি তো পরীক্ষা বিশেষ; আর আল্লাহ, তাঁরই কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার।" *[সূরা আত-তাগাবুন: ১৫]*

ফলে আল্লাহর যিকির ভুলে যায়,

> "হে মুমিনগণ! তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে। আর যারা এরূপ উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।" *[সূরা আল-মুনাফিকুন: ০৯]*

আল্লাহর হক আদায় করে না,

> "আর কেউ কার্পণ্য করলে এবং নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করলে, আর যা উত্তম তাতে মিথ্যারোপ করলে, তার জন্য আমরা সুগম করে দিব কঠোর পথ। আর তার সম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না, যখন সে ধ্বংস হবে।" *[সূরা আল-লাইল: ৮-১১]*

আল্লাহর নিয়ামত ভুলে যায়,

> "সে বলল, 'এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে পেয়েছি।' সে কি জানত না আল্লাহ তার আগে ধ্বংস করেছেন বহু প্রজন্মকে, যারা তার চেয়ে শক্তিতে ছিল প্রবল, জনসংখ্যায় ছিল বেশি? আর অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না।" *[সূরা আল-কাসাস: ৭৮]*

> "অতঃপর যখন কোনো বিপদাপদ মানুষকে স্পর্শ করে, তখন সে আমাদেরকে ডাকে; তারপর যখন তাকে আমরা আমাদের কোনো নিয়ামতের অধিকারী করি তখন সে বলে, 'আমাকে এটা দেওয়া হয়েছে কেবল আমার জ্ঞানের কারণে।' বরং এটা এক পরীক্ষা, কিন্তু তাদের বেশির ভাগই তা জানে না।" *[সূরা আয-যুমার: ৪৯]*

সন্তানসন্ততির ভালোবাসায় কল্যাণকর কাজ থেকে দূরে থাকে,

> "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের স্ত্রী-স্বামী ও সন্তানসন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেকো। আর যদি তোমরা তাদেরকে মার্জনা করো, তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করো এবং তাদেরকে ক্ষমা করো, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" *[সূরা আত-তাগাবুন: ১৪]*

> রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'সন্তান মানুষকে কৃপণ বানায় ও ভীরু বানায়।' *[ইবন হিব্বান, আস-সহীহ, হা. ৩২১১]*

সন্তান লালনপালনে গুনাহ করে বসে।

» স্ত্রী ও নারীর ফিতনা:

> আল্লাহ বলেন, "নারী, সন্তান, সোনারুপার স্তূপ, বাছাই করা ঘোড়া, গবাদি পশু এবং খেতখামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে। এসব দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহ, তাঁরই নিকট রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।" *[সূরা আলে ইমরান: ১৪]*

যেমন মহিলাদের দৃষ্টি, তাদের উলঙ্গ চলাফেরা, তাদের আকর্ষণীয় চাহনি ইত্যাদি।

» শয়তানের অনুসরণ:

> আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রলুব্ধ না করে---যেভাবে সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করেছিল। সে তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখাবার জন্য বিবস্ত্র করেছিল। নিশ্চয় সে নিজে এবং তার দল তোমাদেরকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। নিশ্চয় আমরা শয়তানকে তাদের অভিভাবক করেছি, যারা ঈমান আনে না।" *[সূরা আল-আরাফ: ২৭]*

"হে মুমিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। আর কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজেরই নির্দেশ দেয়। আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই কখনো পবিত্র হতে পারতে না, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" *[সূরা আন-নূর: ২১]*

"আমি অবশ্যই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব; অবশ্যই তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করব, আর অবশ্যই আমি তাদেরকে নির্দেশ দিব, ফলে তারা পশুর কান ছিদ্র করবে। আর অবশ্যই তাদেরকে নির্দেশ দেব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে।' আর আল্লাহর পরিবর্তে কেউ শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করলে সে স্পষ্টতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।" *[সূরা আন-নিসা: ১১৯]*

❑ শয়তান মানুষদেরকে সাতটি মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে ধরাশায়ী করে।

এক. কুফরি করা।

দুই. বিদআত করা।

তিন. কবীরা গুনাহে লিপ্ত করা।

চার. ছোটো ছোটো গুনাহ অনবরত করতে দেওয়া।

পাঁচ. [আবশ্যকীয় কাজের স্থলে] জায়িয কাজে ব্যস্ত রাখা।

ছয়. সামান্য সামান্য অপ্রাধান্যপ্রাপ্ত আমলে ব্যস্ত রাখা।

সাত. শয়তানের জিন ও মানব বাহিনীকের কারো ওপর লেলিয়ে দেওয়া। *[মাদারিজুস সালিকীন ১/২৪৫-২৪৮]*

» এগুলো থেকে বাঁচতে হলে

১. শয়তানের প্রবেশদ্বার জানতে হবে,

২. সর্বদা আল্লাহর যিকিরে লেগে থাকতে হবে,

৩. শয়তানের বন্ধুত্ব ত্যাগ করতে হবে।

❑ মতভেদ ও বিচ্ছিন্নতায় লিপ্ত করা:

আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর এ পথই আমার সরল পথ। কাজেই তোমরা এর অনুসরণ করো এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও।" *[সূরা আল-আনআম: ১৫৩]*

"আর কারো নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সে দিকেই তাকে আমরা ফিরিয়ে দিব এবং তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করাব, আর তা কতই না মন্দ আবাস!" *[সূরা আন-নিসা: ১১৫]*

» আর যেসব কারণে মানুষ মতভেদ ও বিচ্ছিন্নতায় লিপ্ত হয় তা তিনটি:

১. বিদআত করা।

২. প্রবৃত্তির অনুসরণ।

৩. গোঁড়ামি ও দলাদলি।

❑ ফিতনা থেকে বাঁচার উপায় কী?

ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য ইসলামি শরীআত বেশ কিছু দিক-নির্দেশনা দিয়েছে:

১. আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত কুরআন ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা:

"আর তোমরা সকলে আল্লাহর রশি দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো, তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা তো অগ্নিগর্তের দ্বারপ্রান্তে ছিলে, তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা হিদায়াত পেতে পার।" *[সূরা আলে ইমরান: ১০৩]*

"আর তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো, যাতে তোমরা কৃপা লাভ করতে পার।" [সূরা আলে ইমরান: ১৩২]

"আর তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো। আর সাবধানতা অবলম্বন করো তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখ যে, আমাদের রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টভাবে প্রচার করা।" [সূরা আল-মায়িদাহ: ৯২]

"তোমরা রাসূলের আহ্বানকে তোমাদের একে অপরের আহ্বানের মতো গণ্য করো না; তোমাদের মধ্যে যারা একে অপরকে আড়াল করে অলক্ষ্যে সরে পড়ে আল্লাহ তো তাদেরকে জানেন। কাজেই যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" [সূরা আন-নূর: ৬৩]

"আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যা আঁকড়ে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না, আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাত।" [হাকিম, আল-মুসতাদরাক (১/৯৩)]

২. মুসলিমদের জামাআতের সঙ্গে সর্বদা থাকা। দল ও মতে বিভক্ত না হওয়া।

"তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করেছে। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।" [সূরা আলে ইমরান: ১০৫]

"নিশ্চয় যারা তাদের দীনকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোনো দায়িত্ব আপনার নয়; তাদের বিষয় তো আল্লাহর নিকট, তারপর তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানাবেন।" [সূরা আল-আনআম: ১৫৯]

"যে-কেউ মুসলিমদের জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হলো, সে তো ইসলামের রশিকে গলা থেকে খুলে ফেলল।" [আবু দাউদ, আস-সুনান, হা. ৪৭৫৮]

৩. শাসকের আনুগত্য করা। যেখানে শরীআহ বিরোধী না হবে। [মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ১২৯৮, ১৮৪০]

৪. সবর করা। [সূরা আল-বাকারাহ: ১৫৫-১৫৬]

৫. ফিতনার ভয় করা ও তার স্থান থেকে দূরে থাকা।

৬. সত্যিকারের আলিমগণের আশেপাশে থাকা ও তাদের সম্মান করা।

৭. শরঈ ইলম অর্জন করা।

৮. আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করা ও ইবাদাতে রত থাকা।

টীকা-২৪

পরীক্ষা এমন জিনিস, যা মানুষের ওপর আপতিত হবেই।

আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধনসম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। আর আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদেরকে- যারা তাদের ওপর বিপদ এলে বলে, 'আমরা তো আল্লাহরই। আর নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী'। এরাই তারা, যাদের প্রতি তাদের রবের কাছ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ এবং রহমত বর্ষিত হয়, আর তারাই সৎপথে পরিচালিত।" [সূরা আল-বাকারাহ: ১৫৫-১৫৭]

আরো বলেন, "হে মানুষ! তুমি তোমার রবের কাছে পৌঁছা পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, অতঃপর তুমি তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে।" [সূরা আল-ইনশিকাক: ০৬]

সুতরাং কাফির ও ঈমানদার সকলকেই আল্লাহ পরীক্ষা করেন।

❑ **কাফিরদেরকে বিপদাপদে ফেলা ও পরীক্ষা করার কারণসমূহ:**

১. কাফির ও মুনাফিকদেরকে পরীক্ষা করেন তাদের বড়ো বড়ো অপরাধের কিছু নগদ শাস্তির ব্যবস্থা করার মাধ্যমে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর যদি কুরআন এমন হতো যা দ্বারা পর্বতকে গতিশীল করা যেত অথবা জমিনকে টুকরো টুকরো করা যেত অথবা মৃতের সঙ্গে কথা বলা যেত, কিন্তু সব বিষয়ই আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। তবে কি যারা ঈমান এনেছে তারা জানে না যে, আল্লাহ ইচ্ছে করলে সবাইকেই সৎ পথে পরিচালিত করতে পারতেন? আর যারা কুফরি করেছে তাদের কর্মকাণ্ডের কারণে তাদের বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে, অথবা বিপর্যয় তাদের আবাসের আশেপাশে আপতিত হতেই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এসে পড়বে। নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।" *[সূরা আর-রা'দ: ৩১]*

"অতঃপর কী অবস্থা হবে, যখন তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের কোনো মুসীবত হবে? তারপর তারা আল্লাহর নামে শপথ করে আপনার কাছে এসে বলবে, 'আমরা কল্যাণ এবং সম্প্রীতি ছাড়া অন্য কিছুই চাইনি'।" *[সূরা আন-নিসা: ৬২]*

"মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সাগরে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে; ফলে তিনি তাদেরকে তাদের কোনো কোনো কাজের শাস্তি আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।" *[সূরা আর-রূম: ৪১]*

২. কাফিরদেরকে ঈমানের দিকে নিয়ে আসার জন্য,

আল্লাহ বলেন, "আর রাসূল না পাঠানো হলে তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের ওপর কোনো বিপদ হলে তারা বলত, 'হে আমাদের রব্ব! আপনি আমাদের কাছে কোনো রাসূল পাঠালেন না কেন? পাঠালে আমরা আপনার নিদর্শন মেনে চলতাম এবং আমরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম'।" *[সূরা আল-কাসাস: ৪৭]*

"আর অবশ্যই আমরা তাদেরকে মহাশাস্তির পূর্বে কিছু লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা ফিরে আসে। যে ব্যক্তি তার রবের আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হয়ে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে বড়ো যালিম আর কে? নিশ্চয় আমরা অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী।" *[সূরা আস-সাজদাহ: ২১-২২]*

"আর আমরা কোনো জনপদে নবি পাঠালেই সেখানকার অধিবাসীদেরকে অর্থ-সংকট ও দুঃখ-কষ্ট দ্বারা আক্রান্ত করি, যাতে তারা কাকুতিমিনতি করে। তারপর আমরা অকল্যাণকে কল্যাণে পরিবর্তিত করি। অবশেষে তারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয় এবং বলে, 'আমাদের পূর্বপুরুষরাও তো দুঃখ-সুখ ভোগ করেছে।' অতঃপর হঠাৎ আমরা তাদেরকে পাকড়াও করি, এমনভাবে যে, তারা উপলব্ধিও করতে পারে না।" *[সূরা আল-আরাফ: ৯৪, ৯৫]*

তবে ঈমানদারের জন্য পরীক্ষা কাফিরের মতো হয় না। ঈমানদারের ওপর তা শাস্তি না হয়ে পরিণামে শান্তি বা তার কারণ হয়ে থাকে। তার জন্য পরীক্ষা তিক্ত ঔষধের মতো ধরে নিতে হয়, যা খাবার সময় তিক্ত থাকলেও শেষ ফলাফল বিবেচনায় কখনো তা খারাপ বলা চলে না।

❑ ঈমানদারের পরীক্ষায় পড়ার কারণসমূহ:

১. ঈমানদারের ঈমানের দাবির সত্যতা পরীক্ষা করার জন্য,

আল্লাহ বলেন, "আলিফ-লাম-মীম; মানুষ কি মনে করেছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেওয়া হবে? আর অবশ্যই আমরা এদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; অতঃপর আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা মিথ্যাবাদী।" *[সূরা আল-আনকাবূত: ১-৩]*

"তারপর দুঃখের পর তিনি তোমাদেরকে প্রদান করলেন তন্দ্রারূপে প্রশান্তি, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল এবং একদল জাহিলি যুগের অজ্ঞের ন্যায় আল্লাহ সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা করে নিজেরাই নিজেদেরকে উদ্বিগ্ন করেছিল এই বলে যে, 'আমাদের কি কোনো কিছু করার আছে'? বলুন, 'সব বিষয় আল্লাহরই ইখতিয়ারে'। যা তারা আপনার কাছে প্রকাশ করে না, তারা তাদের অন্তরে সেগুলো গোপন রাখে। তারা বলে, 'এ ব্যাপারে আমাদের কোনো কিছু করার থাকলে আমরা এখানে নিহত হতাম না।' বলুন, যদি তোমরা তোমাদের ঘরে

অবস্থান করতে তবুও নিহত হওয়া যাদের জন্য অবধারিত ছিল তারা নিজেদের মৃত্যুস্থানে বের হতো। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরীক্ষা করেন এবং তোমাদের মনে যা আছে তা পরিশোধন করেন। আর অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ বিশেষভাবে অবগত।" *[সূরা আলে ইমরান: ১৫৪]*

"অসৎকে সৎ থেকে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রয়েছ আল্লাহ মুমিনগণকে সে অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন না। অনুরূপভাবে গায়িব সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করা আল্লাহর নিয়ম নয়; তবে আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। কাজেই তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের ওপর ঈমান আন। তোমরা ঈমান আনলে ও তাকওয়া অবলম্বন করে চললে তোমাদের জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে।" *[সূরা আলে ইমরান: ১৭৯]*

"আর আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না আমরা জেনে নেই তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদেরকে এবং আমরা তোমাদের কর্মকাণ্ড পরীক্ষা করি।" *[সূরা মুহাম্মাদ: ৩১]*

২. **ঈমানদারের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য।**

আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমাদেরকে অবশ্যই তোমাদের ধনসম্পদ ও জীবনে পরীক্ষা করা হবে। তোমাদের আগে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের এবং মুশরিকদের কাছ থেকে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে নিশ্চয় তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ।" *[সূরা আলে ইমরান: ১৮৬]*

"তোমরা কি মনে করো যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে আর কে ধৈর্যশীল তা এখনো প্রকাশ করেননি?" *[সূরা আলে ইমরান: ১৪২]*

"নাকি তোমরা মনে করো যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনো তোমাদের কাছে তোমাদের আগের লোকেদের মতো সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত-কম্পিত হয়েছিল। এমনকী রাসূল ও তাঁর সঙ্গীসাথি ঈমানদারগণ বলে উঠেছিল, 'আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?' জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।" *[সূরা আল-বাকারাহ: ২১৪]*

"আর আপনার আগেও অনেক রাসূলের ওপর মিথ্যারোপ করা হয়েছিল; কিন্তু তাদের ওপর মিথ্যারোপ করা ও কষ্ট দেওয়ার পরও তারা ধৈর্যধারণ করেছিল, যে পর্যন্ত না আমাদের সাহায্য তাদের কাছে পৌঁছেছে। আর আল্লাহর বাণীসমূহের কোনো পরিবর্তনকারী নেই। আর অবশ্যই রাসূলগণের কিছু সংবাদ আপনার কাছে এসেছে।" *[সূরা আল-আনআম: ৩৪]*

৩. **ঈমানদারদের গুনাহ মাফ করার জন্য।**

আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর তোমাদের যে বিপদাপদ ঘটে তা তোমাদের হাত যা অর্জন করেছে তার কারণে এবং অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন। আর তোমরা জমিনে (আল্লাহকে) অপারগকারী নও এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই, কোনো সাহায্যকারীও নেই।" *[সূরা আশ-শূরা: ৩০, ৩১]*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'ঈমানদার নারী ও পুরুষের বিপদ হতেই থাকে, তার শরীরে, সম্পদে, সন্তানসন্ততিতে, অবশেষে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তার আর গুনাহ থাকে না। *[মালিক, মুওয়াত্তা, নং ৯৮৪]*

অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'মুসলিমের কোনো বিপদ হলে, ক্ষুৎপিপাসা বা সমস্যা হলে, চিন্তা হলে, পেরেশানী হলে, কষ্ট পেলে, দুশ্চিন্তা হলে, এমনকী কাঁটা বিঁধলেও আল্লাহ সেটার কারণে তার গুনাহের কাফফারা করে দেন।' *[বুখারি, আল-জামিউস সহীহ, হা. ৫৬৪০; মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ২৫৭২]*

৪. **ঈমানদারদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য,**

আল্লাহ তাআলা বলেন, "মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সাগরে বিপর্যয়

ছড়িয়ে পড়েছে; ফলে তিনি তাদেরকে তাদের কোনো কোনো কাজের শাস্তি আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।" [সূরা আর-রূম: ৪১]

"তারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, ব্যয়কারী এবং শেষ রাতে ক্ষমাপ্রার্থী। আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয় তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। আর ফিরিশতাগণ এবং জ্ঞানীগণও; আল্লাহ ন্যায়নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই, (তিনি) পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা আলে ইমরান: ১৭-১৮]

❑ বিপদাপদ-কে ঈমানদার কীভাবে দেখবে?

» ঈমানদার বিপদাপদের দিকে তিন দৃষ্টিতে দেখবে:

১. বিপদে পড়ার আগে: তখন তার একমাত্র কাজ হবে আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাওয়া।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "হে মানুষেরা! তোমরা শত্রুর সাক্ষাৎ কামনা করো না, আল্লাহ তাআলার কাছে নিরাপত্তা চাও।" [বুখারি, আল-জামিউস সহীহ, হা. ২৯৬৬]

অপর হাদীসে এসেছে,

রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে শুনেছেন যে, সে দুআ করছে, 'আল্লাহ আমাকে আখিরাতে যে শাস্তি দিবেন, তা দুনিয়াতে দিয়ে দিন...' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সুবহানআল্লাহ! সে সেটা সহ্য করতে পারবে না। [মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ২৬৮৮]

অপর হাদীসে এসেছে,

রাসূলুল্লাহ ﷺ সকাল বিকালের দুআয় বলতে বলেছেন, 'আল্লাহ আমি আপনার কাছে নিরাপত্তা চাই।...' [আবু দাউদ, আস-সুনান, হা. ৫০৭৪]

সুতরাং বিপদে পড়ার আগে কেউ যেন বিপদ কামনা না করে। এমনকী বিপদ হতে পারে এমনসব কাজ থেকে পারতপক্ষে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বাঁচতে হবে।

তবে যদি সেটা আল্লাহ তাআলার দীনের ব্যাপারে হয় তখন হিকমতের সঙ্গে চলতে হবে, যখন আর কোনো উপায় থাকবে না তখন দীনের জন্য কুরবানি দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

২. বিপদে পড়ার পরে: তখন বড়ো কাজ হবে,

- আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট হওয়া।
- ধৈর্যধারণ করা।
- বিশ্বাস করা যে, এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তার গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।
- বিশ্বাস করা যে, এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন।
- বিশ্বাস করা যে, এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাকে তাঁর দিকে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দিবেন।
- বিশ্বাস করা যে, একমাত্র তিনিই এ বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন।
- বিপদের ভালো দিকগুলো স্মরণ করা। যেমন শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ করেছিলেন।
- দুআ ও যিকিরের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার দিকেই ধাবিত হওয়া।
- আল্লাহ নাখোশ হন এমন কথা না বলা।
- বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ তাআলা কাউকে সাধ্যের বাইরে বিপদে ফেলেন না।
- তাঁর থেকে যারা বেশি বিপদে পড়েছে তাদের কথা স্মরণ করা এবং তাদের চেয়ে নিজের বিপদকে হালকা করে দেখা।
- সর্বদা 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' (অর্থ: নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো) বলা ও অর্থের দিকে খেয়াল করা।

৩. বিপদ থেকে মুক্ত হওয়ার পর:

আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করা, শির্ক ও কুফর না করে বসা।

- বিপদ থেকে মুক্ত হওয়ার পর ইবাদাত আরো বাড়িয়ে দেওয়া।
- অহংকারী না হওয়া বা বাড়াবাড়িতে লিপ্ত না হওয়া।

১৩. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

“

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, বিভাজন, দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষের মধ্যে পতিত হওয়া। সালাফগণের স্লোগান ছিল: একে অপরকে ঘৃণা করো না, একে অপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না। হে আল্লাহর বান্দারা! পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও।[২৫]

”

টীকা-২৫

এখানে তিনটি বিষয়ে পতিত না হওয়াকে সালাফে সালিহীনের মানহাজ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলো সবই কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য দ্বারা সাব্যস্ত। যেমন,

ক. বিচ্ছিন্নতায় পতিত হওয়া থেকে নিষেধ করা: এর প্রমাণ,

১. “আর তোমরা সকলে আল্লাহর রশি দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো, তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা তো অগ্নিগর্তের দ্বারপ্রান্তে ছিলে, তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা হিদায়াত পেতে পার।” *[সূরা আলে ইমরান: ১০৩]*

২. “তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।” *[সূরা আলে ইমরান: ১০৫]*

৩. “নিশ্চয় যারা তাদের দীনকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোনো দায়িত্ব আপনার নয়; তাদের বিষয় তো আল্লাহর নিকট, তারপর তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানাবেন।” *[সূরা আল-আনআম: ১৫৯]*

৪. “যারা নিজেদের দীনকে বিভক্ত করেছে এবং বিভিন্ন দলে পরিণত হয়েছে। প্রত্যেক দলই তাদের কাছে যা আছে, তা নিয়ে উৎফুল্ল।” *[সূরা আর-রূম: ৩২]*

৫. "তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে, আর যা আমরা ওহি করেছি আপনাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে, এ বলে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টি করো না। আপনি মুশরিকদেরকে যার প্রতি ডাকছেন তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তার দীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয় তাকে তিনি দীনের দিকে হিদায়াত করেন।" *[সূরা আশ-শূরা: ১৩]*

খ. মতভেদ মতান্তর, মতদ্বৈধতা ও মতবিরোধ না করার ব্যাপারেও কুরআন ও হাদীসে বহু ভাষ্য রয়েছে। যেমন,

১. আল্লাহর রহমত ছাড়া কেউ মতভেদ থেকে বাঁচতে পারবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন, "নির্দিষ্ট কালের জন্য আমরা যদি তাদের থেকে শাস্তি স্থগিত রাখি তবে তারা অবশ্যই বলবে, 'কীসে সেটা নিবারণ করছে?' সাবধান! যেদিন তাদের কাছে এটা আসবে সেদিন তাদের কাছ থেকে সেটাকে নিবৃত্ত করা হবে না এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টাবিদ্রূপ করে তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে।" *[সূরা হূদ: ০৮]*

২. কাফিরদের সাধারণ চিত্র হচ্ছে মতভেদে লিপ্ত থাকা।

আল্লাহ তাআলা বলেন, "নিশ্চয় তোমরা পরস্পরবিরোধী কথায় লিপ্ত।" *[সূরা আয-যারিয়াত: ০৮]*

"যে বিষয়ে তারা মতানৈক্য করছে।" *[সূরা আন-নাবা: ০৩]*

৩. অর্ধজ্ঞানী যারা হয় তারাই বেশি মতভেদে লিপ্ত হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর ইয়াহূদিরা বলে, 'নাসারাদের কোনো ভিত্তি নেই' এবং নাসারারা বলে, 'ইয়াহূদিদের কোনো ভিত্তি নেই'; অথচ তারা কিতাব পড়ে। এভাবে যারা কিছুই জানে না, তারাও একই কথা বলে। কাজেই যে বিষয়ে তারা মতভেদ করত কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের মধ্যে (সে বিষয়ে) মীমাংসা করবেন।" *[সূরা আল-বাকারাহ: ১১৩]*

"নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন। আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা কেবল পরস্পর বিদ্বেষবশত তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর মতানৈক্য ঘটিয়েছিল। আর কেউ আল্লাহর আয়াতসমূহে কুফরি করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।" *[সূরা আলে ইমরান: ১৯]*

৪. যারা মতভেদে লিপ্ত হয় তারা হক পাওয়ার ক্ষেত্রে হতভাগা হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন, "সেটা এ জন্যই যে, আল্লাহ সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছেন আর যারা কিতাব সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করেছে অবশ্যই তারা সুদূর বিবাদে লিপ্ত।" *[সূরা আল-বাকারাহ: ১৭৬]*

৫. মতভেদের একটি বড়ো কারণ হচ্ছে, দলীল-প্রমাণ আসার পরও অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন, অন্যায় বাড়াবাড়ি করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন, "সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মাত। অতঃপর আল্লাহ নবিগণকে প্রেরণ করেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং তাদের সঙ্গে সত্যসহ কিতাব নাযিল করেন যাতে মানুষেরা যে বিষয়ে মতভেদ করত সেসবের মীমাংসা করতে পারেন। আর যাদেরকে তা দেওয়া হয়েছিল, স্পষ্ট নিদর্শন তাদের কাছে আসার পরে শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত সে বিষয়ে তারা বিরোধিতা করত। অতঃপর আল্লাহ তাঁর ইচ্ছাক্রমে ঈমানদারদেরকে হিদায়াত করেছেন সে সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথের দিকে হিদায়াত করেন।" *[সূরা আল-বাকারাহ: ২১৩]*

"তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।" *[সূরা আলে ইমরান: ১০৫]*

ইমাম মুযানি ﷺ বলেন, এখানে মতভেদের নিন্দা করা হয়েছে আর তাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। *[জামিউ বায়ানিল ইলম (২/৯১০)]*

৬. যারা মতভেদে লিপ্ত হয় এবং ঝগড়ায় নিমজ্জিত হয় তাদের দ্বারা কল্যাণ আশা করা যায় না।

> আল্লাহ তাআলা বলেন, "সে রাসূলগণ, আমরা তাদের কাউকে অপর কারো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাদের মধ্যে এমন কেউ রয়েছেন যার সঙ্গে আল্লাহ কথা বলেছেন, আবার কাউকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। আর মারইয়াম-পুত্র ঈসাকে আমরা স্পষ্ট প্রমাণাদি প্রদান করেছি এবং রূহুল কুদুস দ্বারা তাকে শক্তিশালী করেছি। আর আল্লাহ ইচ্ছে করলে তাদের পরবর্তীরা তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণাদি সমাগত হওয়ার পরও পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতো না; কিন্তু তারা মতভেদ করল। ফলে তাদের কেউ কেউ ঈমান আনল এবং কেউ কেউ কুফরি করল। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতো না; কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা, তা করেন।" *[সূরা আল-বাকারাহ: ২৫৩]*

৭. মতভেদের কারণে মুসলিম শক্তির ক্ষয় হয় এবং তাদের মাঝে ফাটল তৈরি হয়।

> "স্মরণ করো, যখন তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকট প্রান্তে এবং তারা ছিল দূর প্রান্তে আর আরোহী দল ছিল তোমাদের থেকে নিম্নভূমিতে। আর যদি তোমরা পরস্পর যুদ্ধ সম্পর্কে কোনো পূর্বসিদ্ধান্তে থাকতে তবে এ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তোমরা মতভেদ করতে। কিন্তু যা ঘটার ছিল, আল্লাহ তা সম্পন্ন করলেন, যাতে যে-কেউ ধ্বংস হবে সে যেন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পর ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকবে সে যেন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পর জীবিত থাকে; আর নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ আপনাকে স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন যে, তারা সংখ্যায় কম; যদি আপনাকে দেখাতেন যে, তারা সংখ্যায় বেশি তবে অবশ্যই তোমরা সাহস হারাতে এবং যুদ্ধ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। অবশ্যই তিনি অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত।" *[সূরা আল-আনফাল: ৪২-৪৩]*

> "আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবে না। করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ করো; নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন।" *[সূরা আল-আনফাল: ৪৬]*

> "অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন যখন তোমরা আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিনাশ করছিলে, যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারালে এবং নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করলে এবং যা তোমরা ভালোবাসো তা তোমাদেরকে দেখাবার পর তোমরা অবাধ্য হলে। তোমাদের কিছু সংখ্যক দুনিয়া চাচ্ছিল এবং কিছু সংখ্যক চাচ্ছিল আখিরাত। তারপর তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য তাদের (তোমাদের শত্রুদের) থেকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন। অবশ্য তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল।" *[সূরা আলে ইমরান: ১৫২]*

৮. আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মতভেদ হলে কী করতে হবে তা বলে দিয়েছেন।

> "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো, আরো আনুগত্য করো তোমাদের মধ্যকার ক্ষমতাশীলদের, অতঃপর কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত করো আল্লাহ ও রাসূলের নিকট, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান এনে থাক। এ পন্থাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।" *[সূরা আন-নিসা: ৫৯]*

৯. রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে মতভেদ থেকে সাবধান করেছেন এবং মতভেদ হলে কী করতে হবে তা বলে দিয়েছেন।

> "তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, তারা বহু মতভেদ দেখতে পাবে। তোমরা নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কার করা হতে দূরে থাকবে। কেননা তা গুমরাহি। তোমাদের মধ্যে কেউ সে যুগ পেলে সে যেন আমার সুন্নাতে

ও সৎপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতে দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকো। তোমরা এসব সুন্নাতকে মাড়ির দাঁতের সাহায্যে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে।" *[তিরমিযি, আল-জামিউস সুনান, হা.২৬৭৬, হাসান সহীহ]*

গ. মতবিরোধে লিপ্ত হওয়া কখনো সুখকর নয়। কারণ,

১. মতবিরোধ তৈরি করা বিদআতিদের কাজ। উম্মাতে মুসলিমার যে মতটি রাসূল ﷺ, সাহাবায়ে কিরাম, তাবিয়িনে ইযাম, আকীদাহ, ফিকহ ও হাদীসের ইমামগণের কাছ থেকে চলে এসেছে তার থেকে ভিন্ন মত ও পথ যারা অবলম্বন করবে তারা বিদআতি, তারাই মতবিরোধ তৈরি করে উম্মাতের আসল পথ থেকে মানুষদের ভিন্ন পথে নিয়ে গিয়ে বিচ্ছিন্নতা ও ফিরকা তৈরি করে, যা কুরআন ও হাদীসে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় যারা তাদের দীনকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোনো দায়িত্ব আপনার নয়; তাদের বিষয় তো আল্লাহর নিকট, তারপর তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানাবেন।" *[সূরা আল-আনআম: ১৫৯]*

ইমাম বাগাওয়ি ﷺ বলেন, 'যারা বিচ্ছিন্নতা তৈরি করে তারা বিদআতি ও প্রবৃত্তিপূজারী। *[শারহুস সুন্নাহ (১/২১০)]*

ইমাম শাতিবি ﷺ বলেন, 'বিচ্ছিন্নতা তৈরি করা বিদআতিদের নিকৃষ্টতম বৈশিষ্ট্য'। *[আল-ই'তিসাম (১/১১৩)]*

আবুল মুযাফফার আস-সামআনি ﷺ বলেন, 'যখন তুমি বিদআতিদের ও প্রবৃত্তিপূজারীদের দেখবে তখন স্পষ্ট হবে যে তারা বিভিন্ন মত ও পথে বিচ্ছিন্ন, মতভেদে লিপ্ত। *[আল-হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ (২/২২৫)]*

১১. মতবিরোধ ও বিচ্ছিন্নতা মূলত গুনাহের কারণে হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'দুজন মানুষ পরস্পর আল্লাহর জন্য ভালোবাসার পর তাদের মধ্যে কেবল গুনাহের কারণেই বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়'। *[বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, হা. ৪০১। আলবানি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, সহীহ সনদে]*

কাতাদাহ ﷺ বলেন, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত হচ্ছেন, আল্লাহর রহমতের অধিকারী, যদিও তাদের বাড়িঘর কিংবা দেহ দূরে থাকে। আর আল্লাহর অবাধ্যতাকারীরা বিচ্ছিন্নতা তৈরিকারী, যদিও তারা বাড়িঘরে কিংবা দেহে একাত্ম হয়। *[তাবারি, আত-তাফসীর (১২/৮৫)]*

১২. আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ ﷺ বলেন, মতবিরোধ খারাপ কাজ। *[আবু দাউদ, আস-সুনান, হা. ১৯৬০]*

১৩. আলি ﷺ বলতেন, তোমরা যেভাবে মীমাংসা করার সেভাবে করো; কারণ আমি মতবিরোধকে অপছন্দ করি, মানুষ যেন এক জামাআত হয় অথবা আমি যেন সে রকম অবস্থায় মরতে পারি, যেভাবে আমার সাথিরা মারা গেছেন। *[বুখারি, মানাকিবে আলি, হা. ৩৭০৭]*

১৪. ইমাম তাহাওয়ি ﷺ বলেন, 'আর আমরা জামাআতকে সত্য ও সঠিক জ্ঞান করি, বিচ্ছিন্নতাকে বক্রতা ও শাস্তি মনে করি।' *[তাহাওয়ির মতন]*

১৫. শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ ﷺ বলেন, 'কারণ জামাআত বা ঐক্যবদ্ধ থাকা হচ্ছে রহমত, আর বিচ্ছিন্নতা হচ্ছে শাস্তি।' *[মাজমূ ফাতাওয়া (৩/৪২১)]*

মনে রাখা দরকার, 'আমার উম্মাতের মতভেদ রহমত' তা হাদীস হিসাবে সহীহ নয়।' *[ইবন হাযম, আল-ইহকাম মিন উসূলিল আহকাম (৫/৬১); কাসিমি, মাহাসিনুত তাওয়ীল (৪/৯২৮)]*

❑ **দৃষ্টি আকর্ষণ:**

এখানে একটি বিষয় না বললেই নয়, তা হচ্ছে, ফিকহি মাসআলায় যদি কোথাও ইজতিহাদের সুযোগ থাকে, আর তাতে আলিমগণ তাদের ইজতিহাদ অনুযায়ী কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য থেকে ভিন্ন ভিন্ন মত গ্রহণ করেন, আর কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্যে সে মতভেদ হওয়ার অবকাশ থাকে, তবে সেটা অবশ্য নিন্দনীয় মতভেদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ সালাফগণ এ রকম মতভেদে পড়েছিলেন। সাহাবায়ে কিরামের মাঝে বহু ফিকহি মাসআলায় মতভেদ ছিল,

তেমনি তা ছিল তাবিয়িনদের মাঝেও, ইমামগণের মাঝে তো আরো বেশি হয়েছিল, তবে কেউই মতবিরোধ করার উদ্দেশ্যে তা করেননি। প্রত্যেকে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর দীনের খিদমাতে তা করেছেন। সুতরাং সেগুলোকে সাধারণভাবে নিন্দা করা যাবে না, যা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। কিন্তু হক স্পষ্ট হওয়ার পর কেবল নিজের মাযহাব, উস্তাদ, প্রতিষ্ঠান, পীর, শাইখ ইত্যাদির কারণে মতভেদ করা অবশ্যই নিন্দনীয় ও হারাম কাজ হবে।

১৪. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

“

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, দীনের মধ্যে বিদআত করা বা নতুন কোনো আবিষ্কার করা।[২৬] কিছু পরিবর্তন ও প্রচলন করা। বরং তাদের আদর্শিক কথা ছিল: (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের) অনুসরণ করো, বিদআত করা থেকে বিরত থাক; কারণ প্রকৃতপক্ষে তোমাদের (দীনে যা এসেছে তা তোমাদের ইবাদাতের) জন্য যথেষ্ট এবং অনুসরণ করার ক্ষেত্রে প্রাচীন পদ্ধতি (যা রাসূল ও সাহাবায়ে কিরামের ছিল তা) অবলম্বন করো।[২৭]

”

টীকা-২৬

❑ **বিদআত পরিচিতি:** বিদআত শব্দের অর্থ হচ্ছে, নতুন করে পূর্ব নমুনা ছাড়া কিছু তৈরির নাম বিদআত।

পরিভাষায় বিদআত হচ্ছে, 'দীনের মধ্যে এমন কোনো কিছু করা যাতে শরীআত হিসেবে প্রবর্তনের ইচ্ছা থাকে।'

» **বিদআত দুপ্রকার:**

১) প্রকৃত বিদআত: যেমন, হালালকে হারাম করা, হারামকে হালাল করা, যোহরের রাকাআতে কম বেশ করা।

২) আপেক্ষিক বিদআত: বিশেষ ধরনের যিকির প্রবর্তন করা।

» **এ ধরনের বিদআত ছয়ভাবে হয়:**

ক. একই প্রজাতির বাইরে অন্য প্রজাতিকে তাতে যোগ করা। যেমন, ঘোড়া বা মানুষ দিয়ে কুরবানি করা।

খ. একই প্রকারের বাইরে অন্য প্রকারের ইবাদাত যোগ করা। যেমন, রজব মাসের আলাদা ইবাদাত তৈরি করা।

গ. এক সময়ে অন্য সময়ের ইবাদাত করা। যেমন, যিলহজের দশ তারিখের আগেই কুরবানি করা।

ঘ. এক স্থানের ইবাদাত অন্য স্থানে করা। যেমন, কাবা ব্যতীত অন্য কোথাও তাওয়াফ করা।

ঙ. এক পরিমাণ নির্ধারিত ইবাদাত অন্য সংখ্যায় করা। যেমন, একশো বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' নির্ধারণ করা।

চ. একই ধরনের ইবাদাতে অন্য ধরন তৈরি করা। যেমন, জমায়েত হয়ে হালকায়ে যিকির করা; পা ধোয়া দিয়ে ওযু শুরু করা।

❑ **দীনের মধ্যে বিদআত মানেই পথভ্রষ্টতা:** এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য স্পষ্ট। যেমন,

১. দীন পরিপূর্ণ, তাতে বাড়ানো বা কমানোর সুযোগ নেই।

> আল্লাহ তাআলা বলেন, "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে পছন্দ করলাম।" *[সূরা আল-মায়িদাহ: ০৩]*

২. বিদআতকারী প্রবৃত্তির অনুসারী।

> আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমরাও এক কৌশল অবলম্বন করলাম, অথচ তারা উপলব্ধিও করতে পারেনি।" *[সূরা আল-কাসাস: ৫০]*

৩. বিদআতকারী সঠিক পথের বিপরীতে ভিন্ন পথ রচনাকারী বা সেটার অনুসারী।

> আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর এ পথই আমার সরল পথ। কাজেই তোমরা এর অনুসরণ করো এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও।" *[সূরা আল-আনআম: ১৫৩]*

৪. বিদআতকারী সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত।

> আল্লাহ বলেন, "আর সরল পথ আল্লাহর কাছে পৌঁছায়, কিন্তু পথগুলোর মধ্যে বাঁকা পথও আছে। আর তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদের সবাইকেই সৎপথে পরিচালিত করতেন।" *[সূরা আন-নাহল: ০৯]*

৫. বিদআতকারী জামাআতকে বিচ্ছিন্নকারী।

> আল্লাহ তাআলা বলেন, "নিশ্চয় যারা তাদের দীনকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোনো দায়িত্ব আপনার নয়;

তাদের বিষয় তো আল্লাহর নিকট, তারপর তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানাবেন।" [সূরা আল-আনআম: ১৫৯]

৬. বিদআতকারী শরীআত প্রবর্তনকারীর ভূমিকা গ্রহণ করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, "নাকি তাদের এমন কতগুলো শরীক রয়েছে, যারা এদের জন্য দীন থেকে শরীআত প্রবর্তন করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? আর ফয়সালার ঘোষণা না থাকলে এদের মাঝে অবশ্যই সিদ্ধান্ত হয়ে যেত। আর নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" [সূরা আশ-শূরা: ২১]

৭. রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদআত থেকে সাবধান করেছেন। তিনি বলেন,

"সবচেয়ে উত্তম কথা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, উত্তম আদর্শ হচ্ছে মুহাম্মাদ ﷺ-এর আদর্শ, সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হচ্ছে দীনে নতুন উদ্ভাবিত বিষয়গুলো; কারণ প্রতিটি নব উদ্ভাবিত বিষয় বিদআত, প্রতিটি বিদআতই পথভ্রষ্টতা, প্রতিটি বিদআতই জাহান্নামে।" [মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ৮৬৭; নাসায়ি, আস-সুনান, হা. ১৫৭৮]

৮. রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন,

"যে-কেউ আমাদের এ দীনে এমন কোনো আমল করবে যাতে আমাদের কোনো দিক-নির্দেশনা নেই, তা অবশ্যই তার উপর নিক্ষিপ্ত হবে।" [বুখারি, আল-জামিউস সহীহ (৩/৬৯); মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ১৭১৮]

৯. রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন,

"যে-কেউ আমাদের এ দীনে নতুন কিছুর উদ্ভব ঘটাবে, যা তাতে নেই সেটা প্রত্যাখ্যাত হবে।" [মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ১৭১৮]

১০. রাসূলুল্লাহ ﷺ ওই তিন ব্যক্তির কাজকে অনুমোদন করেননি, যারা বিয়ে করবে না, রাতে ঘুমাবে না, দিনে খাবে না বলেছিল। কারণ তা বিদআত। [দেখুন, বুখারি, আল-জামিউস সহীহ, হা. ৫০৬৩।]

১১. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

"অচিরেই আমার উম্মাতের মধ্যে অনেকগুলো দাজ্জাল বা প্রতারক, মিথ্যাবাদীদের আবির্ভাব হবে। যারা তোমাদের কাছে এমন সব বিদআতি কথা নিয়ে আসবে, যা তোমরা এবং তোমাদের বাপদাদারাও কোনোদিন শুনেনি, সুতরাং সাবধান তোমরা তাদের থেকে বেঁচে থাক, তোমাদের জন্য ফিতনায় না ফেলতে পারে।" [মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ০৭]

১২. হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান ﷺ বলেন,

হে আল্লাহর রাসূল, এ কল্যাণের পরে কি কোনো অকল্যাণ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, কিছু মানুষ আমার সুন্নাত ব্যতীত অন্য সুন্নাতের অনুসরণ করবে, আমার আদর্শ ব্যতীত অন্য আদর্শ গ্রহণ করবে। আমি বললাম, এ অকল্যাণের পরে কি আর কোনো অকল্যাণ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, জাহান্নামের আগুনের দিকে আহ্বানকারী একদল লোক হবে, যে তাদের কথায় সাড়া দিবে, তারা তাকে তাতে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে তাদের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিন। রাসূল ﷺ বললেন, তারা আমাদের চামড়ার মতো চামড়ার অধিকারী, আমাদের ভাষার মতো ভাষায় কথা বলবে। আমি বললাম, সে সময় আমি যদি পাই, তাহলে কী করতে আপনি আমাকে নির্দেশ প্রদান করেন? রাসূল ﷺ বললেন, তুমি তখন মুসলিম জামাআত (সাধারণ জনগোষ্ঠী) ও তাদের শাসকের কথা আঁকড়ে ধরে থাকবে। আমি বললাম, যদি তখন কোনো ইমাম ও জামাআত না থাকে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে সকল ধরনের ফিরকা ও দল থেকে নিজেকে দূরে রাখবে, যদিও কোনো গাছের গোড়ায় কামড়ে পড়ে থাকতে হয়, যতক্ষণ না তোমাকে মৃত্যু পেয়ে বসছে, আর তুমি তার ওপরই থাকবে। [বুখারি, আল-জামিউস সহীহ, হা. ৩৬০৬, ৭০৮৪; মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ১৮৪৭]

১৩. ইবন মাসউদ ﷺ বলেন, "তোমরা আমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো, বিদআত করো না; কারণ তোমাদের জন্য সব যথেষ্ট করা হয়ে গেছে।" [আত-তাবারানি, আল-কাবীর, হা. ৮৭৭০; দারিমি, আস-সুনান, হা. ২০৫; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান (২/৪০৭)] হাইসামি বলেন, সহীহ সনদে। [মাজমাউয যাওয়ায়িদ (১/১৮৬)]

১৪. মুআয ইবন জাবাল رضي الله عنه একদিন বলেন, 'তোমাদের সামনের দিনগুলোতে বড়ো বড়ো ফিতনা রয়েছে যাতে সম্পদ বেশি হবে, কুরআন তখন সকলের জন্য উন্মুক্ত হবে। তখন তা গ্রহণ করবে, মুমিন ও মুনাফিক, নারী ও পুরুষ, ছোটো ও বড়ো, স্বাধীন ও পরাধীন। তখন কোনো বক্তার আবির্ভাব হবে, সে বলবে, মানুষের কী হলো যে তারা আমার অনুসরণ করে না, আমিও তো কুরআন পড়েছি? তারা আসলে আমার অনুসরণ করবে না যতক্ষণ না আমি তাদের জন্য অন্য কিছু বিদআতের প্রচলন না করি। সাবধান তোমরা ও সে যা নতুনভাবে আবিষ্কার করেছে। কারণ সে তো কেবল পথভ্রষ্টতা আবিষ্কার করেছে। আমি তোমাদেরকে বিজ্ঞ ব্যক্তির পথভ্রষ্টতার ব্যাপারে সাবধান করছি। কারণ শয়তান কখনো কখনো পথভ্রষ্ট কোনো কথা বিজ্ঞ জনের মুখ দিয়ে বের করে দিবে, কখনো কখনো মুনাফিকও হক কথা বলে।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি মুআয رضي الله عنه-কে বললাম, আল্লাহ আপনার ওপর রহমত করুন, আমি কীভাবে জানতে পারব যে, হাকীম বা বিজ্ঞ ব্যক্তি পথভ্রষ্টতার কথাটি বলেছে, আর মুনাফিক হক কথাটি বলেছে? তখন তিনি বললেন, অবশ্যই বুঝতে পারবে, তুমি বিজ্ঞ ব্যক্তির বক্তব্য হতে যা অপ্রসিদ্ধ (যা দিয়ে সে সুবিধা নিতে চাচ্ছে), যে কথা সম্পর্কে প্রশ্ন করে বলা হয়, এটা কী? এমনসব কথা থেকে বেঁচে থাক; তবে তা যেন তার থেকে মুখ ফিরিয়ে না দেয়, হতে পারে সে নিজে নিজের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, হকের দিশা পাবে তখন সে হকের দিকে ফিরে আসবে, কারণ হকের ওপর আলো থাকে।' *[আবু দাউদ, আস-সুনান, হা. ৪৬১১; বাইহাকি, আল-কুবরা, হা. ২০৯১৬; সহীহ সনদে]*

১৫. আবু ইদরীস আল-খাওলানি رحمه الله বলেন, মসজিদে আগুন লাগছে দেখার পর তা নিভানোর অক্ষমতা আমার কাছে বেশি প্রিয়, তাতে বিদআত হতে দেখে তা পরিবর্তন করতে না পারার চেয়ে। *[মারওয়াযি, আস-সুন্নাহ: ৯৯]*

১৬. ফুদাইল ইবন ইয়াদ رحمه الله বলেন, হিদায়াতের পথ অনুসরণ করো, স্বল্প মানুষ সেটা অনুসরণ করলেও তোমার কোনো ক্ষতি হবে না, সাবধান তুমি ভ্রষ্ট পথ হতে, যদিও সেখানে বিচরণকারীদের সংখ্যা বেশি হয়।

১৭. আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক رحمه الله বলেন, 'জানো প্রিয় ভাই, প্রতিটি এমন মানুষ যিনি সুন্নাতের ওপর চলে মারা যাবে তার জন্য মৃত্যু সম্মানের বিষয়। সুতরাং আমরা আল্লাহর জন্যই, আর আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব। আল্লাহর কাছেই আমরা নিজেদেরকে বন্যপ্রাণীর মতো মনে হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ তুলে ধরছি, বন্ধুরা সব চলে গেছে, সাহায্যকারীদের সংখ্যা কমে গেছে, বিদআতের রমরমা বাজার চলছে। আলিমগণের চলে যাওয়া, আহলুস সুন্নাতের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার কারণে এ উম্মাতের ওপর যে বিশাল বিপদ আপতিত হয়েছে সে ব্যাপারে কেবল আল্লাহর কাছেই অভিযোগ তুলে ধরছি।' *[ইবন ওয়াদ্দাহ, আল-বিদা ওয়ান নাহইয়্যু আনহা, পৃ.২৩]*

১৮. মালিক رحمه الله বলেন, বিদআত করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর খিয়ানত করার অপবাদ দেওয়া হবে। *[শাতিবি, আল-ই'তিসাম (১/৪৯)]*

টীকা-২৭

এটি আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ رضي الله عنه'র একটি উক্তি।

[দেখুন, আত-তাবারানি, আল-মু'জামুল কাবীর, হা. ৪৭৭০; দারিমি, আস-সুনান, হা. ২০৫; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান (২/৪০৭)।]

১৫. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

“

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি দ্বারা সত্যকে জানা, সুতরাং এই ব্যক্তি থেকে যা-ই আসে তা অবশ্যই সত্য হতে পারে।[২৮] বরং তাদের আদর্শ ছিল, সত্যকে জানুন তবেই আপনি সত্যবাদীদের চিনতে পারবেন। সত্যকে জানুন এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকুন।[২৯]

”

টীকা-২৮

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, হক হচ্ছে তা যা দলীলের অনুগামী হবে। সেদিকে তাকানোর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যে, এ মতের দিকে যারা গেছে তারা বেশি, নাকি যারা এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তারা বেশি। কারণ হকের মানদণ্ড লোকসংখ্যা দিয়ে হয় না, বরং হকই হবে ব্যক্তির গ্রহণযোগ্যতার মানদণ্ড। মানুষ কোনো মতকে ঘৃণা করা কিংবা কোনো মতের পক্ষে অবস্থান নেওয়া সে মতটি বিশুদ্ধ হওয়া কিংবা মতটি বাতিল হওয়া প্রমাণ করে না। বরং প্রত্যেকের কথা গ্রহণ করার জন্য দলীল পেশ করতে হবে একমাত্র মুহাম্মাদ ﷺ ব্যতীত। কারণ তাঁকে দিয়েই দলীল দিতে হবে। *[নাকদুল মানতিক, পৃ. ১৫৪; ইবন উসাইমীন, আল-কাওয়ায়িদুল মুসলা, পৃ. ৮৬]*

বস্তুত এটা জানা কথা যে, গ্রহণযোগ্য ইমামগণ, উম্মাতের সকলের কাছে যাদের ব্যাপক সমর্থন দেখা যায়, তাদের কেউই নবি ﷺ-এর কাছ থেকে প্রমাণিত তাঁর সামান্যতম কিংবা বড়ো কোনো সুন্নাতের ইচ্ছাকৃত বিরোধিতা করতেন বলে প্রমাণিত হয়নি। বরং তারা দৃঢ়ভাবে একমত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ ফরয। তারা আরো একমত যে, প্রতিটি মানুষের কথা নেওয়া যাবে এবং ছাড়া যাবে একমাত্র মুহাম্মাদ ﷺ-এর কথা ব্যতীত। কারণ শরীআত প্রণেতা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কেবল তাঁকেই মাসূম বা ভুলত্রুটি মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি ব্যতীত অপর সকলের জ্ঞান ও বুঝে সমস্যা হতে পারে, তাই তাদের কথাকে শরীআতের কাছে পেশ করতে হবে অনুমোদন লাভের জন্য ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের জন্য। আল্লাহ তাআলা একমাত্র তাঁর রাসূলকেই হকের আদর্শ হিসেবে দিয়েছেন।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

> আল্লাহ বলেন, “অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে রাসূলুল্লাহ’র মধ্যে উত্তম আদর্শ, তার জন্য যে আশা রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের এবং আল্লাহকে বেশি স্মরণ করে।” *[সূরা আল-আহযাব: ২১]*

আর রাসূল যাদের থেকে হক দেখতে বলেছেন তাদের কাছে হক পাওয়া যাবে, যেমন, খুলাফায়ে রাশিদা ও সাহাবায়ে কিরাম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ হক চেনা ও হকের লোকদের চেনার কাজটি না করে কোনো বিশেষ ব্যক্তি, গোষ্ঠী, কিংবা নেতাকে হকের মানদণ্ড দাঁড় করিয়েছে। যুগে যুগে এ নীতিটি না মানার কারণে হকের মানদণ্ড কারো কারো কাছে নষ্ট হয়েছে। যেমন,

১. যারা শীআ হয়েছে তাদের কাছে হকের মানদণ্ড হয়ে পড়েছে আহলুল বাইত।

২. যারা খারিজি, তাদের কাছে হকের মানদণ্ড হয়ে পড়েছে শাসকদের বিরুদ্ধে বের হওয়া কিংবা তাকফীর করা।

৩. যারা মুতাযিলা তাদের কাছে হকের মানদণ্ড হয়ে পড়েছে বিবেককে প্রাধান্য দেওয়া।

৪. যারা মাযহাবী গোঁড়ামিতে লিপ্ত তাদের কাছে হকের মানদণ্ড হয়ে পড়েছে ইমামদের কথা।

৫. যারা দলীয় রোগে আক্রান্ত, তাদের কাছে হকের মানদণ্ড হচ্ছে দল প্রধানের বক্তব্য বা কর্মকাণ্ড।

৬. যারা পীরের মুরিদ তাদের কাছে হকের মানদণ্ড হচ্ছে অমুক তরীকা বা সিলসিলাহ।

৭. যারা আশআরি ও মাতুরিদি, তাদের কাছে হকের মানদণ্ড হয়ে পড়েছে তাদের কালামশাস্ত্রের তথাকথিত পণ্ডিতরা।

৮. যারা কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠানের দিকে সম্পৃক্ত করে, তাদের কাছে হকের মানদণ্ড হচ্ছে উক্ত প্রতিষ্ঠান। এভাবেই...

অথচ যুগ যুগ ধরে আলিমরা বলে এসেছেন যে, হকের মানদণ্ড হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ। আলি ﵁-কে হারিস ইবন হাউত জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি মনে করেন যে, তালহা ও যুবাইর বাতিলের ওপর আছে, আর আপনিই বিশুদ্ধ পথে? তখন আলি ﵁ বললেন, 'হে হারিস! তুমি সন্দেহে পতিত হয়েছ। হক কখনো লোকজন দিয়ে বোঝা যায় না, হককে চিনলে তুমি হকের

লোকদের জানতে পারবে।' *[ইবনুল জাওযি, তালবীসে ইবলীস, পৃ. ৭৪; মারঈ আল-হাম্বলি, আকাওয়ীলুস সিকাত, পৃ. ২২২]*

তবে এ নীতির দ্বারা এটা বোঝার সুযোগ নেই যে, ইসলামে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আলিমগণের মর্যাদা নেই। কখনো তা নয়। ইমাম শাতিবি ﵀ বলেন, 'হকই কেবল মূলকথা, মানুষ নয়। তবে এ হক বুঝতে হলে হক কাদের মাধ্যমে এসেছে তাদেরকেও চেনা লাগবে। কারণ তারা সেটার পথ দেখিয়েছে।' এখানে যে বিষয়টির প্রতি জোর দেওয়া হচ্ছে তা হচ্ছে, হক কীভাবে পাওয়া যাবে। হক চিনতে পারলে সহজেই হকের লোকগুলোকে চেনা যাবে। তখন বুঝতে পারবে আমরা কেন সালাফে সালিহীনের কথা মানতে বলি। কারণ:

১. তারা হক জেনেছেন।

২. হক বহন করেছেন।

৩. হক অন্যের কাছে পৌঁছানোর জন্য জীবনের সবকিছু ব্যয় করেছেন। এসব তখনই কেউ বুঝতে পারবে যখন নিজে হক বুঝতে পারবে। তাই হক জানার জন্য সর্বস্ব নিয়োগ করা উচিত।

টীকা-২৯

❑ হক যখন পাওয়া যাবে তখন তা গ্রহণ করতে হবে:

> আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর আল্লাহর প্রতি ও আমাদের কাছে আসা সত্যের প্রতি ঈমান না আনার কি কারণ থাকতে পারে যখন আমরা প্রত্যাশা করি যে, আমাদের রব্ব আমাদেরকে নেককার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন?" *[সূরা আল-মায়িদাহ: ৮৪]*

» যারা হক পাওয়ার পর তা গ্রহণ করে না তাদের ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে,

> "সুতরাং সত্য যখন তাদের কাছে এসেছে তারা তো তাতে মিথ্যারোপ করেছে। অতএব, যা নিয়ে তারা ঠাট্টাবিদ্রুপ করত তার যথার্থ সংবাদ অচিরেই তাদের কাছে পৌঁছবে।" *[সূরা আল-আনআম: ০৫]*

» হক গ্রহণ না করলে আখিরাতে শাস্তির ধমক দেওয়া হয়েছে।

> "আর আপনি যদি দেখতে পেতেন, যখন তাদেরকে তাদের রবের সম্মুখে দাঁড় করানো হবে; তিনি বলবেন, 'এটা কি প্রকৃত সত্য নয়?' তারা বলবে, 'আমাদের রবের শপথ! নিশ্চয়ই সত্য'। তিনি বলবেন, 'তবে তোমরা যে কুফরি করতে তার জন্য তোমরা এখন শাস্তি ভোগ করো'।" *[সূরা আল-আনআম: ৩০]*

» রাসূলগণ হক নিয়ে এসেছেন,

> "আর আমরা তাদের অন্তর থেকে ঈর্ষা দূর করব, তাদের পাদদেশে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ। আর তারা বলবে, 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আমাদেরকে এ পথের হিদায়াত করেছেন। আল্লাহ আমাদেরকে হিদায়াত না করলে, আমরা কখনো হিদায়াত পেতাম না। অবশ্যই আমাদের রবের রাসূলগণ সত্য নিয়ে এসেছিলেন।' আর তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে, 'তোমরা যা করতে তারই জন্য তোমাদেরকে এ জান্নাতের ওয়ারিশ করা হয়েছে'।" *[সূরা আল-আরাফ: ৪৩]*

> "তারা কি শুধু সে পরিণামের অপেক্ষা করে? যেদিন সে পরিণাম প্রকাশ পাবে, সেদিন যারা আগে সেটার কথা ভুলে গিয়েছিল তারা বলবে, 'আমাদের রবের রাসূলগণ তো সত্যবাণী এনেছিলেন, আমাদের কি এমন কোনো সুপারিশকারী আছে যে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে অথবা আমাদেরকে কি আবার ফেরত পাঠানো হবে- যেন আমরা আগে যা করতাম তা থেকে ভিন্ন কিছু করতে পারি?' অবশ্যই তারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং তারা যে মিথ্যা রটনা করত, তা তাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে।" *[সূরা আল-আরাফ: ৫৩]*

» রাসূলগণ হক বলেন,

> "এটা স্থির নিশ্চিত যে, আমি আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া বলব না। তোমাদের রবের কাছ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আমি তোমাদের কাছে এসেছি, কাজেই বনী ইসরাঈলকে তুমি আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও।" *[সূরা আল-আরাফ: ১০৫]*

» নবি-রাসূলগণের কাজই ছিল হক প্রতিষ্ঠা করা,

> "তিনিই সে সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন, যেন তিনি আর সব দীনের উপর একে বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।" *[সূরা আত-তাওবাহ: ৩৩]*

» নবি-রাসূলদের প্রকৃত অনুসারীরা শুধু হকের দাওয়াতই দিয়ে থাকে,

> "অবশ্যই আমরা নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের কাছে। অতঃপর তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদাত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই। নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর মহাদিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি'।" *[সূরা আল-আরাফ: ৫৯]*

> "অতঃপর অযোগ্য উত্তরপুরুষরা একের পর এক তাদের স্থলাভিষিক্তরূপে কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়; তারা এ তুচ্ছ দুনিয়ার সামগ্রী গ্রহণ করে এবং বলে, 'আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে।' কিন্তু ওগুলোর অনুরূপ সামগ্রী তাদের কাছে আসলে তাও তারা গ্রহণ করে; কিতাবের অঙ্গীকার কি তাদের কাছ থেকে নেওয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া বলবে না? অথচ তারা এতে যা আছে তা অধ্যয়নও করে। আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আখিরাতের আবাসই উত্তম; তোমরা কি এটা অনুধাবন করো না?" *[সূরা আল-আরাফ: ১৬৯]*

> "আর যাদেরকে আমরা সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে একদল লোক আছে যারা ন্যায়ভাবে পথ দেখায় ও সে অনুযায়ীই (বিচারে) ইনসাফ করে।" *[সূরা আল-আরাফ: ১৮১]*

সুতরাং হক পেতে হলে আল্লাহর বাণী, রাসূলের আদর্শ ও যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অনুসরণ করে তাদের পথে থাকতে হবে।

১৬. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

“

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, খ্যাতির অনুসন্ধান করা ও মানুষের ওপর অহংকারী হওয়া। কারণ, নিজেকে প্রকাশ করতে আগ্রহী যারা তারা পিঠ ভেঙে দেয় (নিজের ক্ষতিই নিজে করে),[৩০] যখন নবীন বয়সে নেতৃত্ব পেয়ে যায় তখন সে অনেক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়।[৩১]

”

টীকা-২৯

অর্থাৎ একজন মানুষের উচিত নয়, ইখলাস ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করা। যারা নিজেকে প্রকাশ করার জন্য কিছু করে সেটা তার জন্য বিপদের কারণ হয়। পরবর্তীকালে এমন সময়ও তার জীবনে আসতে পারে, তখন সে পালিয়ে বেড়াবে। মানুষের সঙ্গ তার কাছে কষ্টকর বিবেচিত হবে। তখন তার কাছে খ্যাতি হবে বিড়ম্বনা।

নিজেকে প্রকাশ করার আকাঙ্ক্ষা করা নিন্দনীয় কাজ। ঈমানদার সর্বদা বিনয়ী ও গোপনীয়তা পছন্দ করে, সে চায় না তার দিকে আঙুল তোলা হোক। বরং মানুষের জীবনকে তার রবের পথে পরিচালনার একটি বড়ো বাধা হচ্ছে, প্রসিদ্ধ হওয়ার চেষ্টা, মানুষের নেতৃত্ব দেওয়া আকাঙ্ক্ষা, তাদের নেতা হওয়া স্পৃহা। ইমাম তিরমিযি কা'ব ইবন মালিক ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

> রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘দুটি ক্ষুধার্ত বাঘ কোনো ছাগল পালের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হলে যা নষ্ট করবে তার চেয়েও বেশি বিনষ্ট করবে একজন ব্যক্তি কর্তৃক তার দীনের মাধ্যমে সম্পদ ও মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা করা।’ *[তিরমিযি, আল-জামিউ, হা. ২৩৭৬]*

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ ﷺ বলেন, দীন নষ্ট করে সম্পদ আর মর্যাদার লালসা, যা কোনোভাবেই দুটি ক্ষুধার্ত বাঘের দ্বারা ছাগল বিনষ্টের চেয়ে কম নয়, বিষয়টি স্পষ্ট; কারণ নিরোগ দীনে এ লালসার অস্তিত্ব থাকতে পারে না, কেননা যখন কলব আল্লাহর দাসত্ব ও তাঁর ভালোবাসার স্বাদ আস্বাদন করে তখন তার কাছে সেটার চেয়ে বড়ো কিছু আর অবশিষ্ট থাকে না, যার জন্য সে সেটার ওপর অন্য কিছুকে প্রাধান্য দিবে। এভাবেই যারা ইখলাসের অধিকারী তাদেরকে আল্লাহ তাআলা যাবতীয় খারাপ ও অশ্লীলতা থেকে বাঁচিয়ে রাখে।’ *[মাজমূ ফাতাওয়া (১০/২১৫)]*

বস্তুত এ রকম প্রচার ও প্রকাশ হওয়ার ইচ্ছা অন্তরের একটি গোপন রোগ। যা অন্তরকে বিনষ্ট করে দেয়, প্রথম দিকে বান্দা সেটা টের পায় না, যখন তার হুঁশ হয় তখন সে এ বিষয়ে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়ার কারণে তার

পক্ষে আর পশ্চাতের দিকে ফিরে আসা সম্ভব হয় না। শাদ্দাদ ইবন আউস ؓ বলেন, 'হে আরবের অবশিষ্ট লোকেরা, আমি তোমাদের ব্যাপারে অধিক ভয় করছি, রিয়া (লোক দেখানোর প্রবণতা) ও গোপন প্রবৃত্তি।' আবু দাউদ আস-সিজিস্তানিকে বলা হলো, গোপন প্রবৃত্তি কী? তিনি বললেন, 'নেতৃত্বের লোভ'। *[মাজমূ ফাতাওয়া (১০/২১৪-২১৫)]*

এ প্রচার ও জাহির হওয়ার বড়ো বিপদ হচ্ছে, সে চায় মানুষ সকল কিছুর প্রশংসা করুক, হক হোক কিংবা বাতিল। মুআওয়িয়াহ ؓ বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺকে বলতে শুনেছি,

> 'তোমরা সামনাসামনি প্রশংসা করা থেকে বেঁচে থাক; কারণ তা যেন জবাই করে দেওয়া।' *[আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা. ১৬৪৬০, সহীহ সনদে]*

ইবরাহীম ইবন আদহাম ؒ বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধি পছন্দ করে সে বান্দা আল্লাহর সঙ্গে সততা অবলম্বন করেনি'। *[আল-উযলাতু ওয়াল ইনফিরাদু, পৃ. ১২৬]*

ইবরহীম আন-নাখয়ি ও হাসান আল-বসরি ؒ বলেন, 'একজন মানুষের ফিতনায় পড়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে তার দীন বা দুনিয়া নিয়ে কেউ তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করবে, তবে যদি আল্লাহ কাউকে হিফাযত করে সেটা ভিন্ন কথা।' *[ইবনুস সারির, আয-যুহদ (২/৪৪২)]*

মুনাওয়ি ؒ বলেন, প্রশংসা গর্ব ও অহংকারের জন্ম দেয়, এটি ধ্বংসের জায়গা, সেটা জবাই করার মতোই, সেজন্য হাদীসে সেটাকে জবাইয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। গাযালি বলেন, যদি কেউ তোমার কোনো ভালো কাজ করে দেয়, যদি সে শুকরিয়া ও পছন্দ পেতে পছন্দ করে এমন হয় তবে তার প্রশংসা করো না। কারণ তার হক আদায় হবে তখনই যখন তুমি তাকে যুলুম করতে দেখলে তাতে থাকতে দিবে না, আর তার পক্ষ থেকে শুকরিয়ার আকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকা তো যুলুম। যদি সে রকম ব্যক্তি না হয়, তবে তার কাজের জন্য তুমি শুকরিয়া আদায় করো, যাতে সে কল্যাণ কাজে আরো বেশি আগ্রহী হয়।

আমির ইবন সা'দ বলেন, সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস ؓ তার উটের কাছে

ছিলেন, এমন সময় তার কাছে তার ছেলে উমার এল, যখন তাকে সা'দ ؓ দেখলেন, তখন বললেন, 'আমি এ বাহকের ক্ষতি থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই।' অতঃপর (তার ছেলে) উমার নেমে সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাসকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আপনি কি আপনার উট ও ছাগল নিয়ে থাকবেন, এদিকে লোকেরা রাজত্ব নিয়ে টানাহেঁচড়া করছে? তখন সা'দ ؓ তার ছেলের বুকে আঘাত করে বললেন, চুপ থাক। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

> 'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তার তাকওয়াবান, অমুখাপেক্ষী, নিজের পরিচিতি গোপনকারী বান্দাকে ভালোবাসেন'। *[মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ২৯৬৫]*

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালিহ আল-উসাইমীন ؒ বলেন, যখন কেউ নিজেকে প্রকাশ করবে নাকি গোপন করবে এ দুটি গ্রহণ করতে বলা হয়, তখন সে গোপন করাকে বেছে নিবে। আর যদি প্রকাশ করতেই হয় তবে মানুষের মাঝে তার ইলমের প্রচার করবে, ইলমের হালাকায় দারস দিবে, জুমুআহ ও ঈদে খুতবাহ দিবে। কারণ এগুলো আল্লাহ পছন্দ করেন।' *[শারহু রিয়াদুস সালিহীন, পৃ. ৬২৯]* সুতরাং এর বাইরে অন্য কিছুর মাধ্যমে প্রসিদ্ধি অর্জন করার চেষ্টা করা ভালো কাজ নয়।

টীকা-৩১

এজন্য উমার ؓ বলতেন, 'তোমরা নেতা হয়ে যাওয়ার আগে ফিকহ বা ইলমের গভীরতা অর্জন করে নাও।' *[বুখারি, কিতাবুল ইলম; দারিমি, আস-সুনান, হা. ২৫৬, শাইখ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানি, সহীহ সনদে]* ইমাম বুখারি ؒ এর সঙ্গে যোগ করে বলেন, 'আর নেতা হওয়ার পরও; কারণ নবি ﷺ-এর সাহাবিগণ বড়ো বয়সে ইলম অর্জন করেছেন। আবু উবাইদাহ ؒ উমার ؓ'র বক্তব্যের ব্যাখ্যা করে বলেন, 'তোমরা ফিকহ অর্জন করো, যখন তোমরা ছোটো থাক, নেতৃত্ব কাঁধে নেওয়ার আগেই, তখন আমিত্ব ও গর্ব তোমাদেরকে ফকীহ হতে বাঁধা দিবে ফলে তোমরা জাহিল থেকে যাবে।' *[ইবন হাজার, ফাতহুল বারি (১/১৬৬)]*

খতীব আল-বাগদাদি ﷺ বলেন, 'যার সময় আছে, শরীর সুস্থ আছে, তার কাছে ইচ্ছা আছে জাহিলদের স্তর থেকে নিজেকে বের করে আনার, তার অন্তরে দীনের ফিকহ অর্জনের দৃঢ়তা রয়েছে, তার জন্য সে দিকে দ্রুত ধাবিত হওয়া জরুরি; কারণ আশঙ্কা আছে এমন কোনো বাঁধা এসে তা থেকে এটা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে।' *[আল-আখলাকুয যাকিয়্যাহ ফী আদাবিত তালিবিল মারদিয়্যাহ, পৃ. ১৩২]*

১৭. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

“

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, নিখাদ বুদ্ধিভিত্তিক বিজ্ঞানকে গুরুত্ব দেওয়া। সালাফগণের জ্ঞান কেবল ছিল- আল্লাহ যা বলেছেন, তাঁর রাসূল বলেছেন এবং সাহাবিগণ বলেছেন।[৩২]

”

টীকা-৩২

ইলম বলতে বোঝায়, কোনো কিছুর ধারণা অন্তরে অর্জন করা।

❑ **ইলমের প্রকারভেদ:**

ইলম দুপ্রকার: এক. অশুদ্ধ ইলম। দুই. বিশুদ্ধ ইলম। বিশুদ্ধ তখনই হবে যখন তা বাস্তবের সঙ্গে মিল হবে। আর অশুদ্ধ তখন হবে যখন তার কোনো বাস্তবতা নেই।

❑ **অশুদ্ধ ইলমের কিছু উদাহরণ:**

১) কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা ইয়াহূদিদের দাবি

> 'তারা ঈসা আলাইহিস সালামকে হত্যা করেছে' *[সূরা আন-নিসা: ১৫৭]* এটাকে ইলম বলেননি, কারণ তা বাস্তবতা বিবর্জিত।

২) অনুরূপ যারা তাকদীর নির্ধারণকে তাদের ঈমান আনার পথে বাঁধা মনে করেছে, তাদের ব্যাপারেও আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, তাদের কোনো ইলম নেই।

> আল্লাহ বলেন, "যারা শির্ক করেছে অচিরেই তারা বলবে, 'আল্লাহ যদি ইচ্ছে করতেন তবে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষগণ শির্ক করতাম না এবং কোনো কিছুই হারাম করতাম না।' এভাবে তাদের পূর্ববর্তীগণও মিথ্যারোপ করেছিল, অবশেষে তারা আমাদের শাস্তি ভোগ করেছিল। বলুন, 'তোমাদের কাছে কি কোনো জ্ঞান আছে, যা তোমরা আমাদের জন্য প্রকাশ করবে? তোমরা শুধু কল্পনারই অনুসরণ করো এবং শুধু মনগড়া কথা বল'।" *[সূরা আল-আনআম: ১৪৮]*

> "তারা আরো বলে, 'রহমান ইচ্ছে করলে আমরা এদের ইবাদাত করতাম না।' এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই; তারা তো শুধু মনগড়া কথা বলছে।" *[সূরা আয-যুখরুফ: ২০]*

৩) অনুরূপভাবে যারা আল্লাহর সন্তান আছে বলে তাদেরকে কথাও ইলমের বাইরের কথা,

> আল্লাহ বলেন, "এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না। তাদের মুখ থেকে বের হওয়া বাক্য কী সাংঘাতিক! তারা তো শুধু মিথ্যাই বলে।" *[সূরা আল-কাহফ: ০৫]*

> "সাবধান! তারা তো মনগড়া কথা বলে যে, 'আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন।' আর তারা নিশ্চয় মিথ্যাবাদী।" *[সূরা আস-সাফফাত: ১৫১-১৫২]*

৪) তদ্রূপ যারা দুনিয়ার জীবন শেষ ও তা শেষ হওয়ার কারণ হিসেবে সময়কে নির্ধারণ করেছে তাদেরকেও আল্লাহ ইলমের কথার বিপরীত কথা বলেছেন।

> "আর তারা বলে, 'একমাত্র দুনিয়ার জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি, আর কাল-ই কেবল আমাদেরকে ধ্বংস করে।' বস্তুত এ ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞান নেই, তারা তো শুধু ধারণাই করে।" *[সূরা আল-জাসিয়াহ: ২৪]*

৫) তাছাড়া যারা আল্লাহর জন্য শরীক সাব্যস্ত করে তারাও যে জ্ঞানের ওপর নেই তা আল্লাহ তাআলা আমাদের জানিয়েছেন,

> "বলুন, 'তোমরা আমাকে সংবাদ দাও, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক আমাকে দেখাও তো তারা জমিনে কী সৃষ্টি করেছে অথবা আসমানসমূহে তাদের কোনো অংশীদারি আছে কি? এর পূর্ববর্তী কোনো কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোনো জ্ঞান থাকলে তা তোমরা আমার কাছে নিয়ে আস যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।" *[সূরা আল-আহকাফ: ০৪]*

৬) যারা ফিরিশতাদেরকে নারী অথবা আল্লাহর কন্যা বানিয়েছে তাদের কথা যে জ্ঞানের কথা নয় তাও আল্লাহ আমাদের বলেছেন।

> "নিশ্চয় যারা আখিরাতের ওপর ঈমান আনে না তারাই ফিরিশতাদেরকে নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে; অথচ এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞানই নেই,

> তারা তো শুধু অনুমানেরই অনুসরণ করে; আর নিশ্চয় অনুমান সত্যের মোকাবেলায় কোনোই কাজে আসে না।" [সূরা আন-নাজম: ২৭-২৮]

৭) যারা বলে কারো অন্তরে দুটি হৃৎপিণ্ড আছে দাবি করে তাদের কথাকেও আল্লাহ তাআলা জ্ঞান বহির্ভূত কথা বলেছেন। [সূরা আল-আহযাব: ০৪]

৮) যারা অন্যের সন্তানকে নিজেদের সন্তান বলে বা অন্যের সন্তানকে দত্তক গ্রহণ করে তারা যে বায়োলজিক্যালভাবেও তাদের সন্তান নয় কুরআন কিন্তু তাদের এ দাবিকে মিথ্যা বলেছে, যা মুখের কথা, ইলমি কথা নয়।

> আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ কোনো মানুষের জন্য তার অভ্যন্তরে দুটি হৃদয় সৃষ্টি করেননি। আর তোমাদের স্ত্রীগণ, যাদের সঙ্গে তোমরা যিহার করে থাক, তিনি তাদেরকে তোমাদের জননী করেননি এবং তোমাদের পোষ্য পুত্রদেরকে তিনি তোমাদের পুত্র করেননি; এগুলো তোমাদের মুখের কথা। আর আল্লাহ সত্য কথাই বলেন এবং তিনিই সরল পথ নির্দেশ করেন।" [সূরা আল-আহযাব: ০৪]

৯) যারা মিথ্যা শপথ করে কিছু বলে তাদের শপথের মাধ্যমে যা অর্জিত হবে তাও জ্ঞান নয়; কারণ তারা মিথ্যা বলেছে।

> আল্লাহ বলেন, "যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে তখন তারা বলে, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল।' আর আল্লাহ জানেন যে, আপনি নিশ্চয় তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।" [সূরা আল-মুনাফিকূন: ০১]

> "যদি সহজে সম্পদ লাভের আশা থাকত ও সফর সহজ হতো তবে তারা অবশ্যই আপনার অনুসরণ করত, কিন্তু তাদের কাছে যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হলো। আর অচিরেই তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, 'পারলে আমরা নিশ্চয় তোমাদের সঙ্গে বের হতাম।' তারা তাদের নিজেদেরকেই ধ্বংস করে। আর আল্লাহ জানেন নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।" [সূরা আত-তাওবাহ: ৪২]

> "আর যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে ক্ষতিসাধন, কুফরি ও মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং এর আগে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যে লড়াই করেছে তার গোপন ঘাঁটিস্বরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, আর তারা অবশ্যই শপথ করবে, 'আমরা কেবল ভালো চেয়েছি;' আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই তারা মিথ্যাবাদী।" [সূরা আত-তাওবাহ: ১০৭]

> "আপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেননি? তারা কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরি করেছে তাদের সেসব ভাইকে বলে, 'তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, আমরা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে দেশত্যাগী হবো এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনো কারো কথা মানবো না এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব।' আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।" [সূরা আল-হাশর: ১১]

১০) হাশরের মাঠে কাফিরদের বিভিন্ন অজুহাত যে মিথ্যা হবে, তা যে জ্ঞান বহির্ভূত কথা মাত্র সেটাও আল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন।

> আল্লাহ বলেন, "বরং আগে তারা যা গোপন করত তা এখন তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। আর তাদের আবার (দুনিয়ায়) ফেরত পাঠানো হলেও তাদেরকে যা করতে নিষেধ করা হয়েছিল আবার তারা তাই করত এবং নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।" [সূরা আল-আনআম: ২৮]

> "আর যারা শির্ক করেছে, তারা যখন তাদের শরীকদেরকে দেখবে তখন বলবে, 'হে আমাদের রব! এরাই তারা যাদেরকে আমরা আপনার শরীক করেছিলাম, যাদেরকে আমরা আপনার পরিবর্তে ডাকতাম।' তখন শরীকরা এ কথা মুশরিকদের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে বলবে, 'নিশ্চয় তোমরা মিথ্যাবাদী'।" [সূরা আন-নাহল: ৮৬]

> "আর কাফিররা মুমিনদেরকে বলে, 'তোমরা আমাদের পথ অনুসরণ করো তাহলে আমরা তোমাদের পাপভার বহন করব।' কিন্তু ওরা তো তাদের পাপভারের কিছুই বহন করবে না। নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।" [সূরা আল-আনকাবূত: ১২]

> "যেদিন আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন তাদের সবাইকে, তখন তারা আল্লাহর কাছে সেরূপ শপথ করবে যেরূপ শপথ তোমাদের কাছে করে এবং তারা মনে করে যে, এতে তারা ভালো কিছুর ওপর রয়েছে। সাবধান! তারাই তো প্রকৃত মিথ্যাবাদী।" *[সূরা আল-মুজাদালাহ: ১৮]*

১১) যা বাস্তবে সত্য নয় তা কখনো জ্ঞান হতে পারে না।

> আল্লাহ তাআলা বলেন, "কেউ তার ঈমান আনার পর আল্লাহর সঙ্গে কুফরি করলে এবং কুফরির জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি; তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরির জন্য বাধ্য করা হয় কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচলিত।" *[সূরা আন-নাহল: ১০৬]*

> "বরং আমরা তো তাদের কাছে হক নিয়ে এসেছি; আর নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।" *[সূরা আল-মু'মিনূন: ৯০]*

> "তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সুতরাং তারাই আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী।" *[সূরা আন-নূর: ১৩]*

এসব কোনো জ্ঞান নয়, সুতরাং এসব থেকে দূরে থাকতে হবে। যারা এসব জ্ঞান শিক্ষা দেয় বা শিক্ষা নেয় তারা সবচেয়ে বেশি হতভাগা। বর্তমানেও এসব মিথ্যাকে জ্ঞান নাম দিয়ে পড়ানো হচ্ছে, যেমন দর্শনশাস্ত্র কিংবা কালামশাস্ত্র। এগুলো কখনো কোনো কাজে আসে না। মানবজীবনকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয় মাত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ এসব জ্ঞান নামক আপদ থেকে আমাদেরকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে বলেছেন, এমনকী নিজেও এসব জ্ঞান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন।

> তিনি বলেন, "তোমরা আল্লাহর কাছে উপকারী ইলম চাও, আর তাঁর কাছে অপকারী ইলম থেকে আশ্রয় চাও।" *[ইবন আবি শাইবাহ, আল-মুসান্নাফ, হা. ৯১৭১; ইবন মাজাহ, আস-সুনান, হা. ৩৮৪৩; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, হা. ১৬৪৪; হাসান সনদে]*

> অন্য হাদীসে বলেন, "হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে এমন ইলম থেকে আশ্রয় চাই যা উপকার দেয় না।" *[মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ২৭২২]*

ইমাম আহমাদ ﷺ একজন সালাফের প্রশংসা করেছেন এই বলে যে, 'আমি তার ব্যাপারে ঈর্ষা করি যে, তিনি মারা গেছেন অথচ হাদীস ছাড়া অন্য কিছু জানেননি, তিনি কালামশাস্ত্রবিদ ছিলেন না।' *ইমাম যাহাবি, সিয়ারু আলামিন নুবালা (২/৩৩৫)। আরো দেখুন, ইমাম যাহাবি, সিয়ারু আলামিন নুবালা (১২/১২০)।*

এসব ইলমের দিকে সালাফগণ কখনো মুখ তুলেও তাকাননি। সর্বপ্রথম বনী উমাইয়াদের সময়ে এগুলো ইয়াযীদের পুত্র খালিদ শেখার চেষ্টা করেছিল, তারপর বনী আব্বাসের মধ্যে মামুন এগুলোর চর্চা করে মুসলিমদের জন্য বিপদ ডেকে এনেছিল।

❑ উপকারী ইলম ও তার প্রকারভেদ:

যেসব ইলম উপকারী তা দুভাগে বিভক্ত—

এক. দুনিয়ার ইলম। এ ইলম যদি নিছক দুনিয়ার জন্য অর্জন করা হয়, তবে তা জায়িয হলেও প্রশংসিত নয়। কারণ মানুষকে আল্লাহ তাআলা শুধু দুনিয়ার জন্য সৃষ্টি করেননি। দুনিয়াকে একমাত্র নিজের উদ্দেশ্য বানিয়ে ফেলা কখনো অনুমোদিত নয়। আল্লাহ তাআলা এদের সম্পর্কে বলেছেন,

> "এটাই তাদের জ্ঞানের শেষ সীমা। নিশ্চয় আপনার রব্ব, তিনিই ভালো জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনিই ভালো জানেন কে হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে।" *[সূরা আন-নাজম: ৩০]*

> "তারা দুনিয়ার জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে অবগত, আর তারা আখিরাত সম্বন্ধে গাফিল।" *[সূরা আর-রূম: ০৭]*

এমনকী যদি তা দীনী ইলম শিক্ষার পথে বাধা হয়ে যায় বা এ ধরনের জ্ঞান অর্জন করে দীনী ইলমের বিরোধিতা করা হয়, তখন তা অর্জন করা হারাম এবং ক্ষেত্র বিশেষে বড়ো কুফরি ও বড়ো শির্কও হতে পারে।

এর বিপরীতে যদি দুনিয়ার ইলমকে দীনের জন্য ব্যয় করা যায় বা দীনের খিদমতের জন্য দুনিয়ার ইলমকে কাজে লাগানো যায় তবে সেটা অবশ্যই প্রশংসিত ও তা কখনো কখনো ফরযের কাতারে চলে আসে। যেমন, ডাক্তারি বিদ্যা অর্জন করা অথবা সেনাবাহিনীতে যুদ্ধ বিদ্যা অর্জন ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা এটার নির্দেশনাও দিয়েছেন,

> তিনি বলেন, "আর তোমরা তাদের মোকাবেলার জন্য যথাসাধ্য প্রস্তুত রাখ শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী, তা দিয়ে তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জানো না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আর আল্লাহর পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।" *[সূরা আল-আনফাল: ৬০]*

দুই. দীনী ইলম। এ ইলমের প্রতিই আমাদের সালাফগণ বেশি গুরুত্ব দিতেন। বরং তারা এ ইলমের বাইরে অন্য কিছুর দিকে মনোনিবেশ করেননি। কুরআন ও হাদীসে ইলম অর্জনের নির্দেশ, ফযীলত, মাহাত্ম্য, সম্মান ও মর্যাদার যত কিছু এসেছে তার প্রায় অধিকাংশই এ ইলম শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যই। এ ইলম অর্জনের দুটি দিক রয়েছে:

১) মূল ইলমের আগে তার জন্য প্রয়োজনীয় ইলম, যেমন আরবি ভাষা শিক্ষা, নাহু শিক্ষা, সরফ শিক্ষা। এগুলোও ফরয পর্যায়ের তবে ফরযে কিফায়া। কিন্তু এগুলো যখন মূল ইলম শেখার পথে বাঁধা হবে বা মূল ইলমের খাদিম না হয়ে সেটাকেই উদেশ্য হিসেবে নেওয়া হবে, তখন সেটা হবে নিন্দনীয়।

২) মূল ইলম, যা শিখতেই হবে। যার কিছু অংশ সবার জন্য ফরযে আইন, তা হচ্ছে আল্লাহর সত্তা, নাম, গুণ, কর্ম ও অধিকার সম্পর্কে জানা। অর্থাৎ আরকানুল ঈমান ও আরকানুল ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান রাখা। আর যে কাজটি তার জীবনে সে করছে বা করবে সে বিষয়ক ইসলামি শরীআতের নির্দেশনা জানা। এতটুকু অবশ্যই জানতে হবে। আর যা তার চেয়ে বেশি হবে তা জানা ফরযে কিফায়া। কিছু মানুষকে জানতে হবে, যাতে প্রয়োজনে মানুষের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়। সে জন্য আল্লাহ তাআলা সকলকে

জিহাদে যেতে নিষেধ করে মুসলিমদের দুভাগ করে দিয়েছেন। এক ভাগ ইলম অর্জনে ব্যস্ত থাকবে। অপর ভাগ আল্লাহর দীনের হিফাযতের জন্য নিয়মতান্ত্রিক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে।

> আল্লাহ বলেন, "তারা তাওবাকারী, ইবাদাতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকূকারী, সাজদাকারী, সৎকাজের আদেশদাতা, অসৎকাজের নিষেধকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী; আর আপনি মুমিনদেরকে শুভ সংবাদ দিন।" *[সূরা আত-তাওবাহ: ১১২]*

এ ইলম হচ্ছে, আল্লাহর বাণী, রাসূলের হাদীস, সাহাবায়ে কিরামের আসার। উপরে এটাই সালাফগণের মানহাজ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। আসলেই যদি মুক্তি চান, তাহলে এর বিকল্প নেই। এ জ্ঞান অর্জনই ইসলাম সকল মুসলিম নর-নারীর ওপর ফরয করে দিয়েছে।

> রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলিম (নর-নারী) এর ওপর ফরয।" *[ইবন মাজাহ, আস-সুনান, হা. ২২৪]*

এর ইলমই ফরয, যা দীনী ইলম বলে সাব্যস্ত।

এ ইলমের ব্যাপারেই একজন সালাফ বলেছেন, 'তোমরা ইলম অর্জন করো, কেননা তা শিক্ষা করা নেক কাজ, তা পাঠ করা তাসবীহ, তা নিয়ে গবেষণা করা জিহাদ, যে জানে না তাকে তা শিক্ষা দেওয়া সাদাকাহ, সঠিক লোকদের কাছে তা ব্যয় করা আল্লাহর নৈকট্য, তা জান্নাতীদের পথের আলো, একাকিত্বের সঙ্গী, বিদেশ বিভূইয়ে বিশ্বস্ত সাথি, অন্ধকারের পথপ্রদর্শক, জনমানবহীন জায়গায় কথা বলে, শত্রুর ওপর হাতিয়ার, আল্লাহ তাআলা এটাকে দিয়ে কিছু মানুষকে উপরে উঠিয়ে তাদেরকে কল্যাণজনক কাজে নেতা বানিয়ে দেন, হিদায়াতের ময়দানে এমন ইমাম বানিয়ে দেন যাদের অনুসরণ করা হয়, তাদের আমলকে যথাযথ খেয়াল রাখে, ফিরিশতারা তাদের ডানা তাদের প্রতি বিছানোর মাধ্যমে তাদের প্রতি অনুরাগী হয়, প্রতিটি জীবিত ও মৃত প্রাণী তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকী সমুদ্রের মাছ, জমিনের পোকামাকড়, মরু প্রান্তরের হিংস্র প্রাণী, আকাশের তারকা। জেনে রাখ, ইলম হচ্ছে অন্তরসমূহের জীবন, যা অন্ধত্ব থেকে মুক্তি দেয়, চোখের আলো যা অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে

যায়। এর দ্বারাই আল্লাহর আনুগত্য করা হয়, এর দ্বারাই ইবাদাত করা হয়, এর দ্বারাই আল্লাহর হামদ ঘোষণা করা হয়, এর দ্বারাই তাওহীদ প্রচার করা হয়, এর দ্বারাই আত্মীয়তার সম্পর্ক জোড়া দেওয়া হয়, এর দ্বারাই হালাল ও হারাম চেনা যায়। ইলম বিবেকের সামনে চলে, বিবেকের ইমামতি করে, আমল তার অনুগামী, আল্লাহ তাআলা এ ইলমকে সৌভাগ্যবানদের প্রতি ইলহাম করেন, দুর্ভাগাদের তা থেকে মাহরূম করেন, যে ইবাদাতে ফিকহ নেই তাতে কল্যাণ নেই, যে পড়াতে চিন্তা-গবেষণা নেই তাতেও কল্যাণ নেই।'

[খতীব আল-বাগদাদি, ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ (১/১০০); আজুররি, আখলাকুল উলামা ৩৪-৩৫]

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বর্তমানে ফরয ইলম না শিখে অধিকাংশ মানুষ জায়িয ইলম অথবা নিষিদ্ধ ইলম শিক্ষা গ্রহণ নিয়ে ব্যস্ত। যা উম্মাতের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ। আল্লাহ আমাদের হিফাযত করুন। আমীন।

১৮. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

“

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, মুসলিম নেতা ও জনসাধারণকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এবং কিতাবের উপদেশ দেওয়ার ব্যাপারে চুপ থাকা।[৩৩]

”

টীকা-৩৩

বস্তুত উপদেশ প্রদান এ উম্মাতের বৈশিষ্ট্য। উপদেশ দেওয়ার অর্থ কল্যাণ কামনা করা। এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে নির্দেশনা রয়েছে, যেমন,

১. নবিরা সকলেই এ নসীহতের কাজই করতেন।

> আল্লাহ বলেন, "আমি আমার রবের রিসালাত (যা নিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে তা) তোমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করছি। আর তোমরা যা জানো না, আমি তা আল্লাহর কাছ থেকে জানি।" *[সূরা আল-আরাফ: ৬২]*

> "এরপর তিনি তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো আমার রবের রিসালাত (যা নিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে তা) তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছিলাম, কিন্তু তোমরা কল্যাণকামীদেরকে পছন্দ করো না'।" *[সূরা আল-আরাফ: ৭৯]*

> "আর আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিতে চাইলেও আমার উপদেশ তোমাদের উপকারে আসবে না, যদি আল্লাহ তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চান। তিনিই তোমাদের রব্ব এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।" *[সূরা হূদ: ৩৪]*

২. নসীহত থাকলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ না করার ওজর আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য।

> আল্লাহ তাআলা বলেন, "যারা দুর্বল, যারা পীড়িত এবং যারা অর্থ সাহায্যে অসমর্থ, তাদের কোনো অপরাধ নেই, যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়। মুহসিনদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনো পথ নেই; আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" *[সূরা আত-তাওবাহ: ৯১]*

৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক মুসলিমের জন্য নসীহত করাকে দীন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন, দীন হচ্ছে নসীহতের নাম, দীন হচ্ছে নসীহতের নাম, দীন হচ্ছে নসীহতের নাম। আমরা বললাম, কার জন্য?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম শাসকদের জন্য ও সকল সাধারণ মুসলিমের জন্য।’ *[মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ৫৫]*

৪. জারীর ইবন আবদুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে বাইআত করেছি সালাত কায়িমের ওপর, যাকাত প্রদানের ওপর এবং সকল মুসলিমের জন্য নসীহত করার ওপর। *[মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ৫৬]*

৫. যায়িদ ইবন সাবিত ﷺ বলেন,

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘তিনটি বিষয় যখন কোনো মানুষ আকীদাহ হিসেবে গেঁথে নিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, ‘আল্লাহর জন্য ইখলাস, শাসকদের জন্য নসীহত, মুসলিমদের জামাআতের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে থাকা।’ *[দারিমি, আস-সুনান (১/৩০২), হা. ২৩৫]*

৬. আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত,

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনটি বিষয় অপছন্দ করেন, আর তিনটি বিষয়ে সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন। তিনি সন্তুষ্ট হোন, একমাত্র তাঁর ইবাদাত করবে, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না, আল্লাহর রজ্জুকে সকলে একসঙ্গে আঁকড়ে থাকবে, বিচ্ছিন্ন হবে না আর যাদেরকে আল্লাহ তোমাদের ওপর ক্ষমতা প্রদান করেছেন তাদের প্রতি নসীহত করবে। আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি বিষয় অপছন্দ করেন, কীল-কাল করা (অতিরিক্ত খবরদারি করা বা শোনা কথায় কান দেওয়া), অধিক প্রশ্ন করা ও সম্পদ বিনষ্ট করা।’ *[মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ১৭১৫, ৪৪৮৬; মালিক, মুওয়াত্তা, হা. ৪২৫]*

নসীহতের মূল হচ্ছে, নিজের জন্য যা ভালোবাসে অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্যও তা ভালোবাসা। নসীহতের চিহ্ন হবে তিনটি: মুসলিম কারো দীন ও দুনিয়ার বিপদ ও সমস্যায় নিজে চিন্তাক্লিষ্ট হওয়া, তার কল্যাণকামিতা প্রকাশ করা, তাকে তার মাসলাহাত বা ভালো যা আছে সে দিকে দিকনির্দেশ করা, যদিও তার সঙ্গে খারাপ আচরণ করে ও অপছন্দ করে।

নসীহতের বিষয়টি ব্যাপক: তবে আমরা এখানে কেবল শাসকদের সঙ্গে নসীহতের অংশটুকু নিয়ে আলোচনা করব।

ইবন আবদুল বার ﵀ বলেন, আলিমগণ একমত যে, শাসকদের নসীহত করা ফরয। *[আল-ইস্তিযকার (৮/৫৭৯)]*

নাওয়াওয়ি ﵀ বলেন, 'মুসলিম শাসকদের নসীহত হবে, ন্যায়কাজে তাদের সাহায্য করা, তাতে তাদের আনুগত্য করা, তাদেরকে হকের নির্দেশ প্রদান করা, তাদেরকে নম্র ও কোমলভাবে হক কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া, তারা যা থেকে অমনোযোগী হয়ে আছে তা মনে করিয়ে দেওয়া, তাদের কাছে মুসলিমদের যেসব অধিকার আদায় করা হয়নি তা জানিয়ে দেওয়া, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা বের না হওয়া, তাদের আনুগত্য করার জন্য মানুষের অন্তরে মিল-মুহাব্বাতের ব্যবস্থা করা।

খাত্তাবি ﵀ বলেন, তাদের জন্য নসীহতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে তাদের সঙ্গে জিহাদ করা, তাদের কাছে যাকাত প্রদান করা, যখন তাদের থেকে কোনো যুলুম বা খারাপ আচরণ দেখা যায় তখন তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন না করা, তাদের মিথ্যা প্রশংসা করে ধোঁকা না দেওয়া, তাদের জন্য সঠিক পথে চলার দুআ করা।' *[শারহু সহীহ মুসলিম (২/২২৭)]*

আবু নুআইম ﵀ বলেন, শাসক ও গভর্নরদেরকে যারা নসীহত করবে তারা সৎপথ প্রাপ্ত হবে, আর যারা তাদের ধোঁকা দিবে তারা পথভ্রষ্ট হবে এবং সীমালঙ্ঘন করবে। *[ফদীলাতুল আদিলীন, পৃ. ১৪০]*

❑ শাসককে নসীহতের পদ্ধতি:

ইয়াদ ইবন গানাম ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> 'যে-কেউ শাসককে কোনো বিষয়ে নসীহত করতে চায় সে যেন তা প্রকাশ্যে না করে, বরং তার কাছে গিয়ে করে; যদি তার থেকে শাসক তা গ্রহণ করে তো ভালো, না হলে সে তার দায়িত্ব আদায় করেছে।'
> *[আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা. ১৫৩৩৩, সহীহ সনদে]*

অনুরূপ উসামাহ ইবন যায়িদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তাকে বলা হলো, আপনি কি উসমান ﷺ'র কাছে গিয়ে তাকে নসীহত করবেন না? তিনি বললেন, তোমরা কি মনে করো, আমি তার সঙ্গো কথা বলি না? তোমাদেরকে শুনিয়ে বলতে হবে? আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি ও তিনি একান্তে কথা বলেছি, তবে এমন কোনো কাজের সূচনা করতে চাই না, যার শুরুটি আমাকে দিয়ে হবে।' *[মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ২৯৮৯]* নাওয়াওয়ি ﷺ বলেন, এর অর্থ আমি প্রথম সে ব্যক্তি না হই, যে শাসকের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কথা বলেছে। কাযী ইয়াদ ﷺ বলেন, এর অর্থ প্রকাশ্যে বলে খারাপ পরিণতির দিকে মানুষদের পরিচালিত করতে চাই না, বরং শাসকের সঙ্গো কোমল ব্যবহার করা হবে, তাকে গোপনে নসীহত করা হবে এটা গ্রহণযোগ্য হওয়ার বেশি উপযুক্ত। *[ফাতহুল বারি (১৩/৫২)]*

অনুরূপ সাঈদ ইবন জুমহান বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন আবি আওফার কাছে গেলাম, তিনি তখন অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম, তিনি বললেন, তুমি কে? আমি বললাম, আমি সাঈদ ইবন জুমহান। তিনি বললেন, তোমার পিতা কী করেছে? আমি বললাম, তাকে আযারেকাহরা (খারিজিরা) হত্যা করেছে। তিনি বললেন, আল্লাহ আযারেকাহদের ওপর লা'নত করুন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, 'তারা জাহান্নামের কুকুর'। তিনি বলেন, আমি বললাম, আযারেকাহ সম্প্রদায় নাকি সকল খারিজি সম্প্রদায়? তিনি বললেন, বরং সকল খারিজিরা। তিনি বললেন, আমি বললাম, কিন্তু শাসকরা তো মানুষের ওপর যুলুম করছে, তাদের সঙ্গো এটা করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, তখন তিনি আমার হাত শক্ত করে চেপে ধরে বললেন, আফসোস তোমার জন্য, হে ইবন জুমহান! তোমার ওপর কর্তব্য হচ্ছে বড়ো গোষ্ঠীর সঙ্গো থাকা, তোমার ওপর কর্তব্য হচ্ছে বড়ো গোষ্ঠীর সঙ্গো থাকা, যদি শাসক তোমার থেকে কথা শুনে তাহলে তার ঘরে আসবে, তারপর যা তুমি জানো তা তাকে জানাবে। যদি সে তা গ্রহণ করে তবে ভালো, নতুবা তাকে ছেড়ে দাও; কারণ তার থেকে বেশি জানো না।' *[আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা. ১৯৪১৫, হাসান সনদে]*

অন্য হাদীসে এসেছে, যিয়াদ ইবন কুসাইব আল-আদাওয়ি বলেন, আমি আবু বাকরার সঙ্গে ইবন আমেরের মিম্বারের নিচে ছিলাম, তিনি খুতবাহ দিচ্ছিলেন, তার গায়ে ফিনফিনে কাপড় ছিল। আবু বিলাল বলেন, আমাদের আমীরের দিকে তাকাও, সে ফাসিকদের পোশাক পরিধান করেছে। তখন আবু বাকরাহ বললেনে, চুপ করো, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

> ‘যে-কেউ জমিনের বুকে আল্লাহর সুলতানকে অপমান করবে, আল্লাহও তাকে অপমানিত করবেন।’ *[তিরমিযি, আল-জামি, হা. ২২২৪]*

❑ শাসককে নসীহতের বিভিন্ন সুরত:

শাসককে নসীহত করার দুটি অবস্থা হতে পারে:

ক. একান্তে নসীহত করার সুযোগ থাকলে,

১. একান্ত নসীহত করা, যা উপরিউক্ত হাদীসসমূহ থেকে আমরা জেনেছি। আর এটাই শরীআত সম্মত পদ্ধতি। *[ইবনুন নাহহাস, তামবীহুল গাফিলীন, পৃ. ৬৪; শাওকানি, আস-সাইল (৪/৫৫৬); সা‘দি, আর-রিয়াদুন নাদিরাহ: ৫০]*

২. তাকে একান্তে নসীহত করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে নসীহত করা। এটা নিষিদ্ধ; এটিই মুসলিমদের মাঝে প্রথম ফিতনা যা বাগী-রা এনেছিল। তাদের এ প্রকাশ্য বিরোধিতার কারণে বহু সাহাবিকে মারা পড়তে হয়।

৩. তাকে একান্তে নসীহত করার পর মানুষদেরকে বলে বেড়ানো। এটিও হারাম; কারণ:

- তা ইয়াদ ইবন গানাম এর হাদীসের বিপরীত। (হাদীসটি ১৩৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত)
- সালাফরা শাসকদের সঙ্গে তা করতেন না।
- এর মাধ্যমে সে রিয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে, যা ইখলাসের দুর্বলতার প্রমাণ।
- এর মাধ্যমে ফিতনা ও বিচ্ছিন্নতার বীজ বপন করা হয়।
- এর মাধ্যমে শাসককে অপমান করা হয়, যা হাদীসে নিষিদ্ধ।

৪. তার অনুপস্থিতিতে বিভিন্ন বৈঠকে, ওয়াজের স্থানে, খুতবায়, দারসে কেবল তার বিরুদ্ধে বলা। এটা একেবারেই হারাম। কারণ:

- এটিই গীবত, যা ইসলামি শরীআতে হারাম।
- এর মাধ্যমে ফিতনা ও সমস্যা আরো প্রকট হয়।
- এটি উপরিউক্ত ইয়াদ ইবন গানাম-এর হাদীসের বিপরীত। (হাদীসটি ১৩৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত)
- এটি সালাফগণের আদর্শের বিপরীত।
- এর মাধ্যমে শাসককে অপমান করা হয়।
- এর মাধ্যমে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে।

খ. একান্তে নসীহত করার সুযোগ না থাকলে,

১. যদি তিনি এ ব্যাপারে বলার বেশি উপযোগী, না বলা হলে আল্লাহর হক নষ্ট হবে, তাহলে প্রকাশ্যে বলা অনুমোদিত, যেমনটি আবু সাঈদ আল-খুদরি ﷺ মারওয়ানের সামনে সালাত দেরি করে পড়ার কারণে বলেছিলেন। *[দেখুন, বুখারি, আল-জামিউস সহীহ, হা. ৯৫৬।]* অনুরূপ বলেছিলেন, হিশাম ﷺ-কে ইয়াদ ﷺ।

এখানে অবশ্যই জানা দরকার যে, যিনি বলছেন তিনি এমন পর্যায়ের লোক, যার প্রকাশ্যে বলার মতো যোগ্যতা আছে। তার কথার প্রভাব পড়বে আর শাসক তা মানতে বাধ্য হবেন।

২. যদি তিনি এ পর্যায়ের লোক না হন, যার কথা শাসক শুনবেন, তাহলে তিনি কি নিজেকে প্রকাশ্যে বলার মাধ্যমে বিপদের দিকে ঠেলে দিবেন? বস্তুত তখন সামর্থ্যের নীতি চলে আসবে, তার মধ্যকার তৃতীয়টি অবশ্যই থাকতে হবে। কিন্তু তিনি তখন প্রকাশ্যে বলে নিজের ওপর বিপদ ডেকে আনবেন না। সাঈদ ইবন জুবাইর বলেন, একলোক ইবন আব্বাস ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি আমার শাসককে সৎকাজের আদেশ করব? তিনি বললেন, যদি তোমার জানের ভয় থাকে তবে শাসককে ক্ষেপিয়ে দিবে না, যদি করার কিছু থাকে তো তার ও তোমার মাঝে।' *[ইবন আবি শাইবাহ, আল-মুসান্নাফ (১৫/৭৪)]*

৩. যদি আপনি শাসকের কাছে যাওয়ার মতো লোক না হন, তবে যারা যায় তাদের কাছে বলতে পারবেন, নতুবা সবর করবেন ও অন্তরে সে অবস্থার পরিবর্তন কামনা করবেন।

১৯. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

“

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, পার্থিব জীবনের দিকে ঝুঁকে পড়া ও আখিরাতের জন্য আমল ত্যাগ করা।[৩৪]

”

টীকা-৩৪

দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে যাওয়া সালাফগণের মানহাজ ছিল না; কারণ তাঁরা দুনিয়ার বাস্তব অবস্থায় বিশ্বাস করতেন, আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনে ঈমান রাখতেন। দুনিয়ার অবস্থা যদি তুলে ধরা হয় তাহলে দুনিয়াকে কেউ গ্রহণ করবে না। যেমন,

১. দুনিয়ার জীবন শুধু খেল-তামাশা,

> আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর এ দুনিয়ার জীবন তো খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়। আর আখিরাতের জীবনই তো প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত!" *[সূরা আল-আনকাবূত: ৬৪]*

> আরো বলেন, "দুনিয়ার জীবন তো শুধু খেল-তামাশা ও অর্থহীন কথাবার্তা। আর যদি তোমরা ঈমান আনো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের পুরস্কার দিবেন এবং তিনি তোমাদের ধনসম্পদ চান না।" *[সূরা মুহাম্মাদ: ৩৬]*

২. দুনিয়ার জীবনের উদাহরণ,

> আল্লাহ বলেন, "দুনিয়ার জীবনের দৃষ্টান্ত তো এরূপ, যেমন আমরা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি যা দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্গত হয়, যা থেকে মানুষ ও জীবজন্তু খেয়ে থাকে। তারপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয় এবং তার অধিকারীগণ মনে করে সেটা তাদের আয়ত্তাধীন, তখন দিনে বা রাতে আমাদের নির্দেশ এসে পড়ে তারপর আমরা তা এমনভাবে নির্মূল করে দেই, যেন গতকালও সেটার অস্তিত্ব ছিল না। এভাবে আমরা আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা করে।" *[সূরা ইউনুস: ২৪]*

> আরো বলেন, "তোমরা জেনে রাখ, নিশ্চয় দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা, ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক গর্ব-অহংকার, ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছু নয়। এর

উপমা হলো বৃষ্টি, যার উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, তারপর সেগুলো শুকিয়ে যায়, ফলে আপনি এগুলো পীতবর্ণ দেখতে পান, অবশেষে সেগুলো খড়কুটোয় পরিণত হয়। আর আখিরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবন প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া কিছু নয়।" *[সূরা আল-হাদীদ: ২০, সূরা আল-কাহফ: ৪৫]*

"আর আপনি তাদের কাছে পেশ করুন উপমা দুনিয়ার জীবনের: এটা পানির ন্যায় যা আমরা বর্ষণ করি আকাশ থেকে, যা দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয় উদ্গত হয়, তারপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমন চূর্ণবিচূর্ণ হয় যে, বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আর আল্লাহ সবকিছুর ওপর শক্তিমান।"

৩. দুনিয়ার জীবনের সামগ্রী যত বেশি হবে তত বেশি আল্লাহর পথ থেকে পথভ্রষ্ট হবে।

"মূসা বললেন, 'হে আমাদের রব্ব! আপনি তো ফিরআউন ও তার পরিষদবর্গকে দুনিয়ার জীবনে শোভা ও সম্পদ দান করেছেন যা দ্বারা হে আমাদের রব্ব! তারা মানুষকে আপনার পথ থেকে ভ্রষ্ট করে। হে আমাদের রব্ব! তাদের সম্পদ বিনষ্ট করুন, আর তাদের হৃদয় কঠিন করে দিন, ফলে তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত ঈমান আনবে না।" *[সূরা ইউনুস: ৮৮]*

৪. দুনিয়ার জীবন চাকচিক্যময় করে দেওয়া বিষয়।

আল্লাহ বলেন, "ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি দুনিয়ার জীবনের শোভা; আর স্থায়ী সৎকাজ আপনার রবের কাছে পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং কাঙ্ক্ষিত হিসেবেও উৎকৃষ্ট।" *[সূরা আল-কাহফ: ৪৬]*

"যারা কুফরি করে তাদের জন্য দুনিয়ার জীবন সুশোভিত করা হয়েছে এবং তারা মুমিনদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে থাকে। আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করে কিয়ামতের দিন তারা তাদের ঊর্ধ্বে থাকবে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছে অপরিমিত রিযিক দান করেন।" *[সূরা আল-বাকারাহ: ২১২]*

৫. দুনিয়ার জীবনের সামান্য ভোগের সামগ্রী মাত্র।

> আল্লাহ বলেন, "নারী, সন্তান, সোনারুপার স্তূপ, বাছাই করা ঘোড়া, গবাদি পশু এবং খেতখামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে। এসব দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহ, তাঁরই নিকট রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।" *[সূরা আলে ইমরান: ১৪]*

> "আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছে তার জীবনোপকরণ বৃদ্ধি করেন এবং সংকুচিত করেন; কিন্তু এরা দুনিয়ার জীবন নিয়েই আনন্দিত, অথচ দুনিয়ার জীবন তো আখিরাতের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগ মাত্র।" *[সূরা আর-রা'দ: ২৬]*

> "আর তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা তো দুনিয়ার জীবনের ভোগ ও শোভা মাত্র। আর যা আল্লাহর কাছে আছে তা উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা কি অনুধাবন করবে না?" *[সূরা আল-কাসাস: ৬০]*

৬. যে-কেউ শুধু দুনিয়া চাইবে তার পরিণাম জাহান্নাম।

> আল্লাহ বলেন, "যে-কেউ আখিরাতের ফসল কামনা করে তার জন্য আমরা তার ফসল বাড়িয়ে দেই এবং যে-কেউ দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমরা তাকে তা থেকে কিছু দেই। আর আখিরাতে তার জন্য কিছুই থাকবে না।" *[সূরা আশ-শূরা: ২০]*

> "এটা এ জন্যে যে, তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে ঠাট্টা-বিদ্রুপের বস্তু বানিয়েছিলে এবং দুনিয়ার জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল।" *[সূরা আল-জাসিয়াহ: ৩৫]*

> "সুতরাং যে সীমালঙ্ঘন করে এবং দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়। জাহান্নামই হবে তার আবাস।" *[সূরা আন-নাযিআত: ৩৭-৩৯]*

৭. দুনিয়ার জীবন তো ধোঁকার সামগ্রী মাত্র,

> আল্লাহ বলেন, "জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কেবল কিয়ামতের দিনই তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হবে। অতঃপর যাকে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ

করানো হবে সে-ই সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ছাড়া আর কিছু নয়।" *[সূরা আলে ইমরান: ১৮৫]*

"হে মানুষ! নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; কাজেই দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সে প্রবঞ্চক (শয়তান) যেন কিছুতেই তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে প্রবঞ্চিত না করে।" *[সূরা ফাতির: ০৫]*

"হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করো এবং ভয় করো সে দিনকে, যখন কোনো পিতা তার সন্তানের পক্ষ থেকে কিছু আদায় করবে না, অনুরূপ কোনো সন্তান সেও তার পিতার পক্ষ থেকে আদায়কারী হবে না। নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; কাজেই দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সে প্রবঞ্চক যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে।" *[সূরা লুকমান: ৩৩]*

৮. দুনিয়ার সামগ্রী অতীব সামান্য।

আল্লাহ বলেন, "আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যাদেরকে বলা হয়েছিল, 'তোমরা তোমাদের হাত সংবরণ করো, সালাত কায়িম করো এবং যাকাত দাও?' অতঃপর যখন তাদেরকে যুদ্ধের বিধান দেওয়া হলো তখন তাদের একদল মানুষকে ভয় করছিল আল্লাহকে ভয় করার মতো অথবা তারচেয়েও বেশি এবং বলল, 'হে আমাদের রব্ব! আমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান কেন দিলেন? আমাদেরকে কিছু দিনের অবকাশ কেন দিলেন না?' বলুন, 'পার্থিব ভোগ সামান্য এবং যে তাকওয়া অবলম্বন করে তার জন্য আখিরাতই উত্তম। আর তোমাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও যুলুম করা হবে না'।" *[সূরা আন-নিসা: ৭৭]*

"হে ঈমানদারগগণ! তোমাদের কী হলো যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে অভিযানে বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে জমিনে ঝুঁকে পড়? তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার

জীবনে পরিতুষ্ট হয়েছ? আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের ভোগের উপকরণ তো নগণ্য।” *[সূরা আত-তাওবাহ: ৩৮]*

“সুতরাং তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য সামগ্রী মাত্র। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী, তাদের জন্য যারা ঈমান আনে এবং তাদের রবের ওপর নির্ভর করে।” *[সূরা আশ-শূরা: ৩৬, সূরা গাফির: ৩৯]*

৯. নির্বোধরাই কেবল দুনিয়ার জীবন নিয়ে ধোঁকা খায়।

আল্লাহ বলেন, “আর যারা তাদের দীনকে খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করে আপনি তাদের পরিত্যাগ করুন। আর আপনি এ কুরআন দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দিন, যাতে কেউ নিজ কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয়, যখন আল্লাহ ছাড়া তার কোনো অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না এবং বিনিময়ে সবকিছু দিলেও তা গ্রহণ করা হবে না। এরা নিজেদের কৃতকর্মের জন্যই ধ্বংস হয়েছে; কুফরির কারণে এদের জন্য রয়েছে অতিউষ্ণ পানীয় ও কষ্টদায়ক শাস্তি।” *[সূরা আল-আনআম: ৭০]*

“হে জিন ও মানুষের দল! তোমাদের মধ্য থেকে কি রাসূলগণ তোমাদের কাছে আসেনি যারা আমার নিদর্শন তোমাদের কাছে বিবৃত করত এবং তোমাদেরকে এ দিনের সম্মুখীন হওয়া সম্বন্ধে সতর্ক করত?’ তারা বলবে, আমরা আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলাম। বস্তুত দুনিয়ার জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছিল, আর তারা নিজেদের বিরুদ্ধে এ সাক্ষ্যও দিবে, যে তারা কাফির ছিল।” *[সূরা আল-আনআম: ১৩০]*

“যারা তাদের দীনকে খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করেছিল। আর দুনিয়ার জীবন যাদেরকে প্রতারিত করেছিল। কাজেই আজ আমরা তাদেরকে (জাহান্নামে) ছেড়ে রাখব, যেমনিভাবে তারা তাদের এ দিনের সাক্ষাতের জন্য কাজ করা ছেড়ে দিয়েছিল, আর (যেমন) তারা আমাদের আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল।” *[সূরা আল-আরাফ: ৫১]*

১০. দুনিয়ার জীবনের সন্তান ও সম্পদ মানুষকে কষ্টে নিক্ষেপ করে, নাভিশ্বাস উঠিয়ে দেয়।

> আল্লাহ বলেন, "কাজেই তাদের সম্পদ ও সন্তানসন্ততি আপনাকে যেন বিমুগ্ধ না করে, আল্লাহ তো এসবের দ্বারাই তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে শাস্তি দিতে চান। আর তাদের আত্মা দেহত্যাগ করবে কাফির থাকা অবস্থায়।" *[সূরা আত-তাওবাহ: ৫৫]*

> "আর তাদের সম্পদ ও সন্তানসন্ততি আপনাকে যেন বিমুগ্ধ না করে; আল্লাহ তো এগুলোর দ্বারাই তাদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান; আর তারা কাফির থাকা অবস্থায় তাদের আত্মা দেহত্যাগ করে।" *[সূরা আত-তাওবাহ: ৮৫]*

১১. দুনিয়ার জীবন নিয়ে যারা সন্তুষ্ট তারাই গাফিল।

> আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় যারা আমাদের সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না, দুনিয়ার জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট হয়েছে এবং এতেই পরিতৃপ্ত থাকে, আর যারা আমাদের নিদর্শনাবলি সম্পর্কে গাফিল।" *[সূরা ইউনুস: ০৭]*

১২. দুনিয়ার জীবনকে বেশি ভালোবাসার পরিণাম হচ্ছে আযাব।

> আল্লাহ তাআলা বলেন, "আল্লাহর পথে- আসমানসমূহে যা কিছু রয়েছে আর জমিনে যা কিছু রয়েছে তা তাঁরই। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ, যারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাত থেকে অধিক ভালোবাসে এবং মানুষকে ফিরিয়ে রাখে আল্লাহর পথ থেকে, আর আল্লাহর পথ বাঁকা করতে চায়; তারাই ঘোর বিভ্রান্তিতে নিপতিত।" *[সূরা ইবরাহীম: ২-৩]*

> "এটা এ জন্যে যে, তারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের ওপর প্রাধান্য দেয়। আর আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।" *[সূরা আন-নাহল: ১০৭]*

১৩. দুনিয়ার জীবনে ভালো কাজ করে গেলে জান্নাত পাওয়া যাবে।

> "আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছিল তাদেরকে বলা হলো, 'তোমাদের রব্ব কী নাযিল করেছেন'? তারা বলল, 'মহাকল্যাণ।' যারা সৎকাজ করে তাদের জন্য আছে এ দুনিয়ায় মঙ্গল এবং আখিরাতের আবাস আরো উৎকৃষ্ট। আর মুত্তাকিদের আবাসস্থল কত উত্তম!" *[সূরা আন-নাহল: ৩০]*

> "বলুন, হে আমার মুমিন বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করো। যারা এ দুনিয়াতে কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য আছে কল্যাণ। আর আল্লাহর জমিন প্রশস্ত, ধৈর্যশীলদেরকেই তো তাদের পুরস্কার পূর্ণরূপে দেওয়া হবে বিনা হিসেবে।" *[সূরা আয-যুমার: ১০]*

১৪. দুনিয়ার জীবন মূল্যহীন হওয়ায় আল্লাহ তাতে কাফিরকে অনেক কিছুই প্রদান করেন।

> আল্লাহ বলেন, "আর সব মানুষ এক মতাবলম্বী হয়ে পড়বে, এ আশঙ্কা না থাকলে দয়াময়ের সঙ্গে যারা কুফরি করে, তাদেরকে আমরা দিতাম তাদের ঘরের জন্য রৌপ্য-নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি যাতে তারা আরোহণ করে এবং তাদের ঘরের জন্য দরজা ও পালঙ্ক- যাতে তারা হেলান দেয়, আর (অনুরূপ দিতাম) স্বর্ণ নির্মিতও এবং এ সবই তো শুধু দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সম্ভার। আর আখিরাত আপনার রবের নিকট মুত্তাকিদের জন্যই।" *[সূরা আয-যুখরুফ: ৩৩-৩৫]*

> "আর যারা কুফরি করেছে যেদিন তাদেরকে জাহান্নামের সামনে পেশ করা হবে (সেদিন তাদেরকে বলা হবে) 'তোমরা তোমাদের দুনিয়ার জীবনেই যাবতীয় সুখ-সম্ভার নিয়ে গেছ এবং সেগুলো উপভোগও করেছ। সুতরাং আজ তোমাদেরকে দেওয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি; কারণ তোমরা জমিনে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে এবং তোমরা নাফরমানি করতে'।" *[সূরা আল-আহকাফ: ২০]*

> "অতএব আপনি তাকে উপেক্ষা করে চলুন যে আমাদের স্মরণ থেকে বিমুখ হয় এবং কেবল দুনিয়ার জীবনই কামনা করে।" *[সূরা আন-নাজম: ২৯]*

১৫. দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেওয়ার পরিণতি হচ্ছে হিদায়াত নসীব না হওয়া।

> আল্লাহ বলেন, "কিন্তু তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দাও।" *[সূরা আল-আলা: ১৬]*

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাদীসে দুনিয়ার জীবনের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। যেমন,

১.

> নবি ﷺ একবার বাজারের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন একটি মরা ছোটো কানবিশিষ্ট ছাগল দেখে বললেন, কে এটা এক দিরহাম দিয়ে কিনবে? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, এটা কোনো কিছু দিয়ে কেনার প্রশ্নই আসে না, এটা দিয়ে কী করব? তারপর তিনি বললেন, তোমরা কী পছন্দ করো এটা তোমাদের হোক? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, জীবিত থাকলে তাতে দোষ ছিল, সে তো কানে ছোটো, তারপর সেটা তো মৃত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, দুনিয়া আল্লাহর কাছে এর চেয়েও মূল্যহীন।' *[মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ২৯৫৭]*

২. রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন,

> "দুনিয়া অভিশপ্ত আর তাতে যা আছে তাও অভিশপ্ত, তবে যা আল্লাহর যিকির হবে অথবা তার সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে, আর আলিম শিক্ষক ও মুতাআল্লিম বা ছাত্র [এরা অভিশপ্ত নয়]।" *[তিরমিযি, আল-জামিউ, হা. ২৩২২]*

৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন,

> "দুনিয়া যদি আল্লাহর কাছে মাছির ডানার মতোও মূল্য হতো তবে তিনি কাফিরকে এক ফোঁটা পানিও পান করাতেন না।" *[তিরমিযি, আল-জামিউ, হা. ২৩২০]*

৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন,

"আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার উদাহরণ সমুদ্রে তোমাদের কেউ আঙুল ডুবিয়ে বের করলে যতটুকু আসে তার মতোই, তোমাদের কেউ দেখুক কতটুকু আসে।" *[তিরমিযি, আল-জামিউ, হা. ২৩২৩]*

৫. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"দুনিয়া মুমিনের কয়েদখানা আর কাফিরের জান্নাত।" *[মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ২৯৫৬]*

৬. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"তোমরা জমিন গ্রহণ করো না, তাহলে দুনিয়ার প্রতি মোহ এসে যাবে।" *[তিরমিযি, আল-জামি, হা. ২৩২৮]*

৭. রাসূলুল্লাহ ﷺ দুনিয়ার ব্যাপারে আমাদেরকে সাবধান করে বলেছেন,

"আমি তোমাদের জন্য দারিদ্রতার ভয় করছি না, তবে আমি তোমাদের ওপর ভয় করছি দুনিয়ার প্রশস্তি লাভ করা, যেমনি তা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেদের ওপর প্রশস্ত হয়েছিল, অতঃপর তোমরা তা নিয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে, যেমনটি তারা প্রতিযোগিতা করেছিল, আর তা তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবে, যেমনিভাবে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিল।" *[বুখারি, আল-জামিউস সহীহ, হা. ৪০১৫; মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ২৯৬১]*

৮. রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার চাটাইতে ঘুমানোর কারণে তার পার্শ্বদেশে দাগ পড়েছিল, সাহাবায়ে কিরাম বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জন্য যদি একটি ফরাসের ব্যবস্থা করা যেতো? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

'আমার আর দুনিয়ার কী? আমি তো দুনিয়াতে একজন সওয়ারির ন্যায় যে গাছের নিচে ছায়ায় বসেছে তারপর সে গাছ ছেড়ে করে চলে গেছে।' *[তিরমিযি, আল-জামিউ, হা. ২৫৭৭]*

৯. রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কিরাম ভালো খাবার খাননি। কিন্তু তাদের ঈমান ছিল পর্বতসম।

১০. রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক সময় ক্ষুধায় পেটে পাথর বাঁধতেন। সাহাবায়ে কিরাম কখনো কখনো গাছের পাতা ব্যতীত কিছুই পাননি।

❑ দুনিয়াবিমুখ কেন হতে হবে?

দুনিয়া আখিরাতের জন্য খেতস্বরূপ। তারপরও তার প্রতি মোহ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ:

১. দুনিয়াকে একমাত্র উদ্দেশ্য নেওয়া হলে চিন্তা থাকবে প্রবৃত্তি পূর্ণ করা, তারপর তা আখিরাত থেকে বিমুখ করে দিবে।

২. যদি দুনিয়ার চাহিদা পূরণ করতে নেমে যায় তখন তাকে গুনাহে লিপ্ত করবে।

৩. যদি দুনিয়ার চিন্তা কারো কাছে বড়ো হয়ে যায়, তখন শাস্তি অনিবার্য হয়ে যাবে।

৪. দুনিয়া মূলত পার হওয়ার পথ মাত্র। সেখানে অবস্থান নিয়ে নিলে আসল বাড়ি ভুলে যাব।

৫. দুনিয়া নশ্বর, তা চিরস্থায়ী কখনো হবে না। তার সম্পদ ও চাকচিক্য মানুষদের ধোঁকাগ্রস্ত করে।

৬. দুনিয়ার ভালোবাসা সকল প্রকার অনিষ্টের মূল।

৭. দুনিয়ার ভালো ও মন্দে অনেক মানুষই টিকে থাকতে পারে না।

৮. দুনিয়ার ভালোবাসা মানুষকে অন্ধ করে দেয়। সে ভালোমন্দ বিচারের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

৯. দুনিয়া কখনো ওয়াদা পূরণ করে না।

১০. দুনিয়ার ভালোবাসার সর্বশেষ পরিণতি কষ্টের।

২০. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

“

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, হাদীসকে অস্বীকার করা অথবা তাতে কোনো আপত্তি তোলা যদিও সেটা আকলে বা বিবেকের যুক্তিতে না ধরে।[৩৫] বরং তাদের মানহাজ ছিল: অনুসরণ এবং কায়মনোবাক্যে মেনে নেওয়া, তারা বলেন, আমরা সবকিছুর ওপর ঈমান আনলাম, সবই আমাদের রবের পক্ষ থেকে এসেছে।[৩৬]

”

টীকা-৩৫

হাদীস বিশুদ্ধ হলে তার ওপর বিবেক দিয়ে যাচাই করার চিন্তা করাও অপরাধ। কারণ হাদীস বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য যেসব শর্ত দেওয়া হয়েছে সেসব শর্ত পূরণ হলেই তা কেবল বিশুদ্ধ হাদীস হয়। হাদীস বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য যেসব শর্ত দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে সনদের দিক যেমন আছে 'মতন' বা ভাষ্য বিশুদ্ধ হওয়ার দিকও দেখার বিষয় রয়েছে। এগুলোর জন্য বিবেক অনেক বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে। সে মানদণ্ডে টিকলেই কেবল হাদীসটি বিশুদ্ধ হয়, তাই আবার হাদীসটিকে কাদের বিবেকের যুক্তির কাছে প্রদান করা হবে?

এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য 'সহীহ হাদীস বিশ্বকোষ'-এর প্রথম খণ্ডের ভূমিকা দেখতে পারেন।

টীকা-৩৬

বস্তুত এটি কুরআনে কারীমে আল্লাহর কথা। যেমন,

১. আল্লাহ তাআলা বলেন,

> "অতঃপর তাদের কিছুসংখ্যক তাতে ঈমান এনেছিল এবং কিছু সংখ্যক তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল; আর দগ্ধ করার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট।" *[সূরা আন-নিসা: ৫৫]*

২. ঈমানদার শুধু বলবে, শুনলাম ও মানলাম।

> আল্লাহ তাআলা বলেন, "রাসূল তাঁর রবের পক্ষ থেকে যা তাঁর কাছে নাযিল করা হয়েছে তার ওপর ঈমান এনেছেন এবং মুমিনগণও। প্রত্যেকেই ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণের ওপর। আমরা তাঁর রাসূলগণের কারো মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলে: আমরা শুনেছি ও মেনে নিয়েছি। হে আমাদের রব্ব! আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল।" *[সূরা আল-বাকারাহ: ২৮৫]*

> আরো বলেন, "মুমিনদের উক্তি তো এই- যখন তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়, তখন তারা বলে, 'আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম।' আর তারাই সফলকাম।" *[সূরা আন-নূর: ৫১]*

৩. আরো বলেন,

> "রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।" *[সূরা আল-হাশর: ০৭]*

৪. আরো বলেন,

> "আর যারা ইলমে সবল তারা বলেন, আমরা এর ওপর ঈমান আনলাম, সবই তো আমাদের রবের পক্ষ থেকে এসেছে।" *[সূরা আলে ইমরান: ০৭]*

৫. আরো বলেন,

> "আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ের ফয়সালা দিলে কোনো মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর জন্য সে বিষয়ে তাদের কোনো (ভিন্ন সিদ্ধান্তের) ইখতিয়ার সংগত নয়। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হলো।" *[সূরা আল-আহযাব: ৩৬]*

৬. কাফির-মুনাফিকরাই শুধু এর বিপরীত কাজ করতে পারে।

> আল্লাহ বলেন, "আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে তারা ঈমান এনেছে, অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও সেটাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়? তাদেরকে যখন বলা হয় আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে আস, তখন মুনাফিকদেরকে আপনি আপনার কাছ থেকে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখবেন।" *[সূরা আন-নিসা: ৬০-৬১]*

> "আর যখন তাদেরকে ডাকা হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে, তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করে দেওয়ার জন্য, তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর যদি হক তাদের স্বপক্ষে হয়, তাহলে তারা বিনীতভাবে রাসূলের কাছে ছুটে আসে। তাদের অন্তরে কি রোগ আছে, না তারা সংশয় পোষণ করে? না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি যুলুম করবেন? বরং তারাই তো যালিম।" *[সূরা আন-নূর: ৪৮-৫০]*

৭. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফয়সালা কেউ না মানলে সে ঈমানদার হতে পারবে না।

> আল্লাহ তাআলা বলেন, "অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।" *[সূরা আন-নিসা: ৬৫]*

৮. কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা তার ওপর ঈমানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রাসূলের নির্দেশকে মানার আবশ্যকতা ঘোষণা করেছেন। সেটাকেই ইহসান হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

> আল্লাহ বলেন, "তার চেয়ে দীনে আর কে উত্তম যে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের মিল্লাতকে অনুসরণ করে? আর আল্লাহ ইবরাহীমকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।" *[সূরা আন-নিসা: ১২৫]*

> "আর যে নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে, এমতাবস্থায় যে সে মুহসিন সে তো দৃঢ়ভাবে ধরলো এক মজবুত হাতল। আর যাবতীয় কাজের পরিণাম আল্লাহরই কাছে।" *[সূরা লুকমান: ২২]*

৯. যারা রাসূলের নির্দেশ মানবে না তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে মহাবিপর্যয়,

> আল্লাহ বলেন, "তোমরা রাসূলের আহ্বানকে তোমাদের একে অপরের

আহ্বানের মতো গণ্য করো না; তোমাদের মধ্যে যারা একে অপরকে আড়াল করে অলক্ষ্যে সরে পড়ে আল্লাহ তো তাদেরকে জানেন। কাজেই যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের ওপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" *[সূরা আন-নূর: ৬৩]*

২১. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

“

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, প্রত্যেক আয়াত ও হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা, যদি না আয়াতটি দলীল হিসেবে মুহকাম (রহিত বা অস্পষ্ট নয়) হবে আর হাদীসটি অনুসরণীয় সুন্নাহ (খাস বা সীমাবদ্ধ ইত্যাদি না) হবে।[৩৭]

”

টীকা-৩৭

সালাফে সালিহীন দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে কুরআনের আয়াত বা হাদীস হলে তা রহিত না হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হতেন। তেমনি তা কোনো বিশেষ অবস্থার জন্য নির্দিষ্ট কি না তার ব্যাপারেও নিশ্চিত হতেন। তারা সর্বদা মুহকাম আয়াত দিয়ে দলীল দিতেন। এর বিপরীতে বিদআতিরা মুতাশাবিহ আয়াতসমূহের পিছনে দৌড়ায়। আর তারা এমন সব হাদীস দিয়ে দলীল দিতে চেষ্টা করে যাতে অনেক অর্থ হতে পারে। অর্থাৎ সালাফে সালিহীন মুতাশাবিহ আয়াতসমূহকে মুহকাম আয়াতের আলোকে তাফসীর করতেন। কিন্তু বিদআতিরা মুহকাম আয়াতকে মুতাশাবিহ আয়াতের কাছে নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করে।

২২.

এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

“

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, তারা পৃথিবীতে অহংকারী হবে; কারণ সালাফগণ ছিলেন কল্যাণ, কোমলতা ও দয়ার মাধ্যমে আহ্বানকারী।

”

২৩. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

“

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, বিদআতে পতিত হওয়ার কারণে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে বিদআতি বলে ঘোষণা করা, যতক্ষণ না তার বিরুদ্ধে প্রমাণ দাঁড় করানো হয় এবং প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ ও (বিদআতি ঘোষণা করতে) কোনো বাধা না থাকে।

”

২৪. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

"

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, তাকফীরের শর্ত পূরণের দলীল কায়িমের পূর্বেই নির্দিষ্ট কাউকে কাফির ঘোষণা করা এবং তাকে কাফির ঘোষণা করতে কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকা।[৩৮]

"

টীকা-৩৮

কুফর বা বিদআত সম্পৃক্ত করার পূর্বশর্ত:

নির্দিষ্ট কারোর প্রতি কুফর বা বিদআত সম্পৃক্ত করার আগে অবশ্যই বেশ কিছু বিষয় নিশ্চিত হতে হবে:

» যিনি কারো প্রতি কুফর বা বিদআত সম্পৃক্ত করছেন, তার জন্য শর্ত হচ্ছে:

১. বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান। নিজে না জেনে অপরের ত্রুটি চিহ্নিত করা যায় না।

> আল্লাহ বলেন, "আর যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না; কান, চোখ, হৃদয়- এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।" *[সূরা আল-ইসরা: ৩৬]*

> আরো বলেন, "আর তোমাদের জিহ্বা মিথ্যারোপ করে বলে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা রটনা করার জন্য তোমরা বলো না, 'এটা হালাল এবং এটা হারাম'। নিশ্চয় যারা আল্লাহর ওপর মিথ্যা রটায়, তারা সফলকাম হবে না।" *[সূরা আন-নাহল: ১১৬]*

> আরো বলেন, "বলুন, নিশ্চয় আমার রব্ব হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা। আর পাপ ও অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন এবং কোনো কিছুকে আল্লাহর শরীক করা- যার কোনো সনদ তিনি নাযিল করেননি। আর আল্লাহর সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যা তোমরা জানো না।" *[সূরা আল-আরাফ: ৩৩]*

২. বিষয়টি কোনো মতভেদপূর্ণ মাসআলা না হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া।

» যার প্রতি কুফর বা বিদআত সম্পৃক্ত করছেন, তার জন্য শর্ত হচ্ছে:

১. তার কাছে এর প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করা। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন,

> "যে সৎপথ অবলম্বন করবে সে তো নিজেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করে এবং যে পথভ্রষ্ট হবে সে তো পথভ্রষ্ট হবে নিজেরই

> ধ্বংসের জন্য। আর কোনো বহনকারী অন্য কারো ভার বহন করবে না। আর আমরা রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত শাস্তি প্রদানকারী নই।" *[সূরা আল-ইসরা: ১৫]*

২. তার সন্দেহ দূরীকরণের চেষ্টা করা। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুআয ইবন জাবাল ؓ'র সন্দেহ দূর করেছিলেন যখন তিনি তাকে সাজদাহ করে বসেন। *[ইবন মাজাহ, আস-সুনান, হা. ১৮৫৩]*

» যে সব বাঁধা বিদ্যমান থাকলে কাউকে তাকফীর বা তাবদি করা যাবে না তা হচ্ছে:

১. মূর্খতা থাকলে। তা অবশ্য এমন জায়গায় বড়ো হওয়া যেখানে মূর্খ থেকে যাওয়ার সঙ্গত কারণ বিদ্যমান, যেমন এমন পরিবেশে থাকা যেখানে ইসলাম জানার সুযোগ পর্যাপ্ত নয়।

২. জোর করা হলে। কারণ তখন ব্যক্তি তার স্বাভাবিক তাকলীফ-এর অধীন থাকে না। তা অবশ্য এমন জোর করাকে বোঝানো হচ্ছে যাতে কোনো ব্যক্তির আর কোনো উপায় না থাকে।

> আল্লাহ তাআলা বলেন, "কেউ তার ঈমান আনার পর আল্লাহর সঙ্গে কুফরি করলে এবং কুফরির জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার ওপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি; তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরির জন্য বাধ্য করা হয় কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচলিত।" *[সূরা আন-নাহল: ১০৬]*

৩. ভুল করে হয়ে থাকলে। কারণ কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে দুআ শিখিয়ে দিয়েছেন তাতে ভুল করে কিছু করলে সেটার জন্য ক্ষমার কথা আছে।

> "আল্লাহ কারো ওপর এমন কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না যা তার সাধ্যাতীত। সে ভালো যা উপার্জন করে তার প্রতিফল তারই, আর মন্দ যা কামাই করে তার প্রতিফল তার ওপরই বর্তায়। 'হে আমাদের

রব্ব! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব্ব! আমাদের পূর্ববর্তীগণের ওপর যেমন বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের ওপর তেমন বোঝা চাপিয়ে দিবেন না। হে আমাদের রব্ব! আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না যার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর আপনি আমাদের পাপ মোচন করুন, আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি দয়া করুন, আপনিই আমাদের অভিভাবক। অতএব, কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।" *[সূরা আল-বাকারাহ: ২৮৬]*

"ডাকো তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ-পরিচয়ে; আল্লাহর নিকট এটাই বেশি ন্যায়সঙ্গত। অতঃপর যদি তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয় না জানো, তবে তারা তোমাদের দীনী ভাই ও বন্ধু। আর এ ব্যাপারে তোমরা কোনো অনিচ্ছাকৃত ভুল করলে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই; কিন্তু তোমাদের অন্তর যা স্বেচ্ছায় করেছে (তা অপরাধ), আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" *[সূরা আল-আহযাব: ০৫]*

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসেও সেটাকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

'আল্লাহ তাআলা আমার উম্মাতের ভুল ও বিস্মৃতি আর তারা যাতে জোর-জবরদস্তিতে পতিত হয়ে করবে, তা ক্ষমা করে দিয়েছেন।'
[ইবন মাজাহ, আস-সুনান (১/৬৫৭)]

৪. তাওয়ীল বা অপব্যাখ্যা করে কাজটি করে থাকলে। আর কাজটি যে অপব্যাখ্যার মাধ্যমে করা হচ্ছে সেটি ব্যক্তির জানা না থাকলে। তবে যদি ইচ্ছা করে তাওয়ীল করে আকীদাহ বিনষ্টকারী হয় তবে সেখানে তা ওজর হবে না।

৫. তাকলীদ থাকলে। তবে সে তাকলীদের সংগত কারণ থাকতে হবে। কারণ তাকলীদ করে মাফ পেয়ে গেলে সব কাফিররাই তাকলীদের ওজর পেশ করবে।

৬. অপারগ হয়ে গেলে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন,

"আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব প্রদান করেন না।" *[সূরা আল-বাকারাহ: ২৮৬]*

২৫. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

“

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, রাসূল ﷺ-এর মর্যাদার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করা এবং মহান আল্লাহর মর্যাদার সমান করে দেওয়া।[৩৯]

”

টীকা-৩৯

যেসব কারণে মানুষ শির্ক, কুফর ও বিদআতে লিপ্ত হয় তন্মধ্যে বড়োটি হচ্ছে সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি।

১. পূর্ববর্তী ইয়াহূদি ও নাসারা সম্প্রদায়সহ যাবতীয় কাফির ও মুশরিকরা এ বাড়াবাড়ির কারণেই শির্কে পতিত হয়েছে।

> আল্লাহ তাআলা বলেন, “হে কিতাবীরা! স্বীয় দীনের মধ্যে তোমরা বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর ওপর সত্য ব্যতীত কিছু বলো না। মারইয়াম-তনয় ঈসা মসীহ কেবল আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর বাণী, যা তিনি মারইয়ামের কাছে পাঠিয়েছিলেন ও তাঁর পক্ষ থেকে রূহ। কাজেই তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের ওপর ঈমান আন এবং বলো না, ‘তিন!’ নিবৃত্ত হও, এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। আল্লাহই তো এক ইলাহ; তাঁর সন্তান হবে--তিনি এটা থেকে পবিত্র-মহান। আসমানসমূহে যা কিছু আছে ও জমিনে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই; আর কর্মবিধায়করূপে আল্লাহই যথেষ্ট।” [সূরা আন-নিসা: ১৭১]

> আরো বলেন, “যারা বলে, ‘নিশ্চয় মারইয়াম-তনয় মসীহই আল্লাহ’, তারা অবশ্যই কুফরি করেছে। বলুন, ‘আল্লাহ মারইয়াম-তনয় মসীহ, তাঁর মাতা এবং দুনিয়ার সকলকে যদি ধ্বংস করতে ইচ্ছে করেন তবে তাঁকে বাধা দেওয়ার শক্তি কার আছে?’ আর আসমানসমূহ ও জমিন এবং এ দুয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।” [সূরা আল-মায়িদাহ: ১৭]

অনুরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> ‘তোমরা দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করা থেকে বেঁচে থাক; কারণ তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে তাদের দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করাই ধ্বংস করে দিয়েছে।’ [আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা. ১৮৫১]

২. এ উম্মাতের ধ্বংসও এ বাড়াবাড়িতে নিহিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মাতকে তাঁর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। যেমন,

> রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কিছু লোক এসে বলতে লাগল, আন্তা সাইয়্যিদুনা ওয়া ইবন সাইয়্যিদিনা, অর্থাৎ 'আপনি আমাদের নেতা আর আমাদের নেতার ছেলে'। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, 'আস-সাইয়্যিদ' তো মহান আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা। আমরা বললাম, আপনি আমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বে উপরে, দানে বড়ো। তখন তিনি বললেন, তোমাদের কথা বলো, বা কোনো কোনো কথা বলো, তবে শয়তান যেন তোমাদেরকে বাড়তি কথার দিকে টেনে না নিতে পারে সেটা খেয়াল রেখো। *[আবু দাউদ, আস-সুনান, হা. ৪৮০৬]*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> "তোমরা আমাকে সে রকম বাড়াবাড়ি প্রশংসা করো না, যেমনটি নাসারারা মারইয়াম-তনয় ঈসার ব্যাপারে করেছিল, আমি তো কেবল তাঁর দাস। সুতরাং তোমরা বলো যে, তিনি আল্লাহর দাস ও তাঁর রাসূল।" *[বুখারি, আল-জামিউস সহীহ, হা. ৩৪৪৫]*

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন,

> "আল্লাহর শপথ! আমি পছন্দ করি না তোমরা আমাকে আমার মর্যাদা, যাতে আল্লাহ আমাকে রেখেছেন তার চেয়ে উপরে তুলবে।" *[আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা. ১২৫৫০]*

যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে তারা যত মিথ্যা ও অসমর্থ কিছু রাসূলের দিকে সম্পৃক্ত করে, যেমন তারা বলে, রাসূল নূরের তৈরি। দুনিয়া রাসূলের জন্য তৈরি, রাসূলের ছায়া ছিল না, রাসূল উদ্ধার করতে পারেন, রাসূল গায়িব জানেন ইত্যাদি।

২৬. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

"

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যতীত অন্য কাউকে নিষ্পাপ মনে করা,[৪০] আল্লাহ তাকে মহিমান্বিত করুন এবং তাকে নিরাপত্তা দান করুন।

"

টীকা-৪০

নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টি একমাত্র নবি-রাসূলদের জন্য নির্ধারিত। অন্য কেউ তা নিজের জন্য বা নবি-রাসূল ব্যতীত অন্য কারো জন্য দাবি করলে, তা মিথ্যা দাবি হবে। কারণ সে-ই মাসুম বা নিষ্পাপ হবেন যাকে আল্লাহ নিষ্পাপ করবেন। কুরআন ও হাদীসে নবি-রাসূল ব্যতীত অপর কারো জন্য নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টি বর্ণিত হয়নি।

ইসমাত বা মাসুম-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ১) নিরাপত্তা লাভ, ২) সুরক্ষা, ৩) প্রতিরোধ।

ইসমাত বা নবিরা মাসুম-এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে, 'আল্লাহ কর্তৃক তাঁর নবিদেরকে প্রেরিত ওহি গ্রহণ করা ও প্রচার করার সময় হিফাযত করা, তাদের ভেতর ও বাহিরকে কবীরা গুনাহতে পতিত হওয়ার ব্যাপারে হিফাযত করা ও তিরস্কার করা যায় এমন গুনাহের ওপর স্থির থাকা থেকে রক্ষা করা।' *[ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ ফাতাওয়া (১০/২৮৯, ২৯৩)]*

❑ মাসুম হওয়ার দলীল:

বস্তুত এ বিষয়ে একক দলীল দেওয়া যায় না। ইসমাত বা মাসুম হওয়া ও গুনাহ থেকে নিরাপত্তা লাভের প্রতিটি প্রসঙ্গের ওপর দলীল পেশ করা যায়। তাহলে আমাদেরকে আগে নির্ধারণ করতে হবে নবি-রাসূলগণ কীসের থেকে মাসুম বা নিরাপদ।

❑ মাসুম হওয়া যেসব বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত তা নিম্নরূপ:

১. হত্যা থেকে মাসুম হওয়া। এটি আমাদের নবির জন্য খাস। এর বাইরে আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা তা দিয়েছেন।

> আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে রাসূল! আপনার রবের কাছ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা প্রচার করুন; যদি না করেন তবে তো আপনি তাঁর বার্তা প্রচার করলেন না। আর আল্লাহ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।" *[সূরা আল-মায়িদাহ: ৬৭]*

অনুরূপ এক হাদীসে এসেছে এক কাফির বেদুইন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরবারি নিয়ে তাঁর ওপর চড়াও হয়, কিন্তু পরমুহূর্তে তার হাত থেকে তরবারি পড়ে যায়। *[বুখারি, আল-জামিউস সহীহ, হা. ২৯১০; মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ৮৪৩]*

২. ওহি গ্রহণ ও বহন করার সময়। আর তখন তিনি নিম্নোক্ত দুটি বিষয় থেকে মাসুম ও নিরাপদ:

ক. ভুল করা থেকে। শয়তান এ ভুল করাতে পারে না।

> আল্লাহ তাআলা বলেন, "বিভ্রান্তদের মধ্যে যে তোমার অনুসরণ করবে সে ছাড়া আমার বান্দাদের ওপর তোমার কোনোই ক্ষমতা থাকবে না।" *[সূরা আল-হিজর: ৪২]*

> "বিভ্রান্তদের মধ্যে যে তোমার অনুসরণ করবে সে ছাড়া আমার বান্দাদের ওপর তোমার কোনো ক্ষমতাই থাকবে না, তবে তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দারা ব্যতীত।" *[সূরা স্বদ: ৮২-৮৩]*

> "শপথ নক্ষত্রের, যখন তা অস্তমিত হয়, তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়।" *[সূরা আন-নাজম: ১-২]*

> "অতএব আমি কসম করছি তার, যা তোমরা দেখতে পাও এবং যা তোমরা দেখতে পাও না তারও; নিশ্চয় এ কুরআন এক সম্মানিত রাসূলের (বাহিত) বাণী। আর এটা কোনো কবির কথা নয়; তোমরা খুব অল্পই ঈমান পোষণ করে থাক, এটা কোনো গণকের কথাও নয়, তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করো। এটা সৃষ্টিকুলের রবের কাছ থেকে নাযিলকৃত।" *[সূরা আল-হাক্কাহ: ৩৮-৪৩]*

> "নিশ্চয় এ কুরআন সম্মানিত রাসূলের আনীত বাণী যে সামর্থ্যশালী, আরশের মালিকের কাছে মর্যাদা সম্পন্ন, সে মান্য সেখানে, বিশ্বাসভাজন। আর তোমাদের সাথি উন্মাদ নন, তিনি তো তাকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছেন, তিনি গায়িবি বিষয় সম্পর্কে কৃপণ নয়। আর এটা কোনো অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নয়।" *[সূরা আত-তাকওয়ীর: ১৯-২৫]*

> "আর শয়তানরা এটাসহ নাযিল হয়নি। আর তারা এ কাজের যোগ্যও নয় এবং তারা এর সামর্থ্যও রাখে না। তাদেরকে তো শোনার সুযোগ হতে দূরে রাখা হয়েছে।" *[সূরা আশ-শুআরা: ২১০-২১২]*

খ. ভুলে যাওয়া। এটা থেকে নবি-রাসূলগণ নিরাপদ।

> আল্লাহ তাআলা বলেন, "তাড়াতাড়ি ওহি আয়ত্ত করার জন্য আপনি তা নিয়ে আপনার জিহ্বাকে দ্রুত সঞ্চালন করবেন না। নিশ্চয় এর সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমাদেরই। কাজেই যখন আমরা তা পাঠ করি আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন, তারপর তার বর্ণনার দায়িত্ব নিশ্চিতভাবে আমাদেরই।" *[সূরা আল-কিয়ামাহ: ১৬-১৯]*

৩. ওহি প্রচার ও প্রসারে নবি-রাসূলগণ মাসুম। আর কয়েকটি বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত:

ক. রিসালাতে মিথ্যা বলা থেকে:

> আল্লাহ বলেন, "আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না। তাতো কেবল ওহি, যা তার প্রতি ওহিরূপে প্রেরিত হয়।" *[সূরা আন-নাজম: ৩-৪]*

অনুরূপ হাদীসে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস ﷺ বলেন,

> আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সবকিছু লিখতাম, মুখস্থ করতে চাইতাম। কুরাইশরা আমাকে নিষেধ করল এবং বলল, তুমি কি যা শুনতে পাও সবই লিখ? অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষ, ক্রোধ ও সন্তুষ্টি অবস্থায় কথা বলেন। তখন আমি লেখা থেকে বিরত থাকলাম। অতঃপর তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তার হাত দিয়ে মুখের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'তুমি লেখ, যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি, এ মুখ থেকে কেবল হকই বের হয়'। *[আবু দাউদ, আস-সুনান, হা. ৩৬৪৬]*

সুতরাং এর মাধ্যমে সাব্যস্ত হলো যে,

» কুরআনে কোনো রটনা প্রবেশ করবে না।

> "আর এ কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো রচনা হওয়া সম্ভব নয়। বরং এর আগে যা নাযিল হয়েছে এটা তার সত্যায়ন এবং আল কিতাবের বিশদ ব্যাখ্যা। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটা সৃষ্টিকুলের রবের পক্ষ থেকে। নাকি তারা বলে, 'তিনি এটা রচনা করেছেন?' বলুন, 'তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য যাকে পার ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।" *[সূরা ইউনুস: ৩৭-৩৮]*

» কুরআনে সৃষ্টির পক্ষ থেকে কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধিত হবে না।

> "আর যখন আমাদের আয়াত, যা সুস্পষ্ট, তাদের কাছে পাঠ করা হয় তখন যারা আমাদের সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না তারা বলে, 'অন্য এক কুরআন আনো এটা ছাড়া, বা এটাকে বদলাও।' বলুন, 'নিজ থেকে এটা বদলানো আমার কাজ নয়। আমার প্রতি যা ওহি হয়, আমি শুধু তারই অনুসরণ করি। আমি আমার রবের অবাধ্যতা করলে অবশ্যই মহা দিনের শাস্তির আশঙ্কা করি।" *[সূরা ইউনুস: ১৫]*

> "আর সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে আপনার রবের বাণী পরিপূর্ণ। তাঁর বাক্যসমূহের পরিবর্তনকারী কেউ নেই। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"
> *[সূরা আল-আনআম: ১১৫]*
>
> তাই ওহি ব্যতীত আর কোনোভাবে তা রহিত হবে না। "আর যখন আমরা এক আয়াতের স্থানে পরিবর্তন করে অন্য আয়াত দেই- আর আল্লাহই ভালো জানেন যা তিনি নাযিল করবেন সে সম্পর্কে-, তখন তারা বলে, 'আপনি তো শুধু মিথ্যা রটনাকারী', বরং তাদের অধিকাংশই জানে না। বলুন, 'আপনার রবের কাছ থেকে রূহুল-কুদুস -জিবরীল- যথাযথভাবে একে নাযিল করেছেন, যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সুদৃঢ় করার জন্য এবং হিদায়াত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ'।"
> *[সূরা আন-নাহল: ১০১-১০২]*

» আল্লাহর ওপর মিথ্যা রটনা বড়ো অপরাধের একটি।

> আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর তার চেয়ে বড়ো যালিম আর কে যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রটনা করে, কিংবা বলে, 'আমার কাছে ওহি হয়,' অথচ তার প্রতি কিছুই ওহি করা হয় না এবং যে বলে, 'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন আমিও তার মতো নাযিল করব?' আর যদি আপনি দেখতে পেতেন, যখন যালিমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে এবং ফিরিশতাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে, 'তোমাদের প্রাণ বের করো। আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হবে, কারণ তোমরা আল্লাহর ওপর অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াতসমূহ সম্পর্কে অহংকার করতে'।" *[সূরা আল-আনআম: ৯৩]*

> "নাকি তারা বলে যে, সে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে, যদি তা-ই হতো তবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে আপনার হৃদয় মোহর করে দিতেন। আর আল্লাহ মিথ্যাকে মুছে দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। নিশ্চয় অন্তরসমূহে যা আছে সে বিষয়ে তিনি সবিশেষ অবগত।" *[সূরা আশ-শূরা: ২৪]*

> "তিনি যদি আমাদের নামে কোনো কথা রচনা করে চালাতে চেষ্টা করতেন, তবে অবশ্যই আমরা তাকে পাকড়াও করতাম ডান হাত দিয়ে, তারপর অবশ্যই আমরা কেটে দিতাম তার হৃৎপিণ্ডের শিরা, অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেউই নেই যে তাঁকে রক্ষা করতে পারে।" *[সূরা আল-হাক্কাহ: ৪৪-৪৭]*

খ. রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক কোনো ওহি লুকানো অসম্ভব:

> আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে রাসূল! আপনার রবের কাছ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা প্রচার করুন; যদি না করেন তবে তো আপনি তাঁর বার্তা প্রচার করলেন না। আর আল্লাহ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।" *[সূরা আল-মায়িদাহ: ৬৭]*

গ. রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক ওহি প্রচারে ভুল হওয়া অসম্ভব:

> আল্লাহ তাআলা বলেন, "তিনিই গায়িবি বিষয়ের জ্ঞানী, তিনি তাঁর গায়িবের জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না, তাঁর মনোনীত রাসূল ছাড়া। সে ক্ষেত্রে আল্লাহ তাঁর রাসূলের সামনে এবং পিছনে প্রহরী নিয়োজিত করেন, যাতে তিনি প্রকাশ করেন যে, অবশ্যই তারা তাদের রবের রিসালাত পৌঁছে দিয়েছেন। আর তাদের কাছে যা আছে তা তিনি জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি প্রতিটি বস্তু গণনা করে হিসাব রেখেছেন।" *[সূরা আল-জিন: ২৬-২৮]*

» আলিমগণ এ বিষয়ে একমত বা ইজমা করেছেন যে, প্রচারের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ মাসুম। তার কোনো ভুল হয়নি।

৪. ইজতিহাদে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইসমাত বা ভুলত্রুটির ওপর স্থির থাকা থেকে নিরাপদ হওয়া। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক ইজতিহাদ করেছেন এটাই সত্য, তবে সেসব ইজতিহাদ সুন্নাহ হিসেবে আমাদের কাছে এসেছে। আর যেসব ইজতিহাদে রাসূলুল্লাহ ﷺ সঠিকটির বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করেছেন আল্লাহ তাআলা সেগুলোকে অনেক কোমলভাবে ঠিক করে দিয়েছেন বা অনুমোদন করে দিয়েছেন। যেমন, বদরের যুদ্ধের অনেক ঘটনা।

৫. সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে নিরাপদ হওয়া। এর দুটি দিক রয়েছে,

ক. নবুওয়াতের আগে, তখন কি নবি-রাসূলগণ মাসুম ছিলেন? এ ব্যাপারে তিনটি মত রয়েছে:

» নবুওয়াতের আগে সকল ধরনের গুনাহ থেকে মুক্ত থাকা তাদের জন্য অপরিহার্য। এ মতের প্রবক্তা হচ্ছে রাফিজিরা। তাদের সঙ্গে আছে অধিকাংশ মুতাযিলারা তবে তারা সগীরা গুনাহ জায়েজ হওয়ার পক্ষে বলে কেবল যা ঘৃণা তৈরি করবে এমনটি না সংঘটিত হওয়ার পক্ষে।

» নবুওয়াতের আগে সকল ধরনের গুনাহ থেকে মুক্ত হওয়া অপরিহার্য নয়। এটি কাযি আবু বকর আল-বাকিল্লানি ও অনেক আলিম বলে থাকেন।

» শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ ﷺ এ ব্যাপারে মধ্যপন্থি বক্তব্য দিয়েছেন, তিনি বলেন, কেবল চারিত্রিক উৎকর্ষ আছে এমন লোকদেরকেই আল্লাহ তাআলা নবুওয়াতের জন্য বাছাই করে থাকেন। এ জন্য অন্যান্য গুনাহের বিষয়টি হওয়া দোষল নয়। এর ওপর তিনি দলীল নিয়েছেন, আল্লাহর আগত বাণী থেকে।

> আল্লাহ বলেন, "তাঁর সম্প্রদায়ের অহংকারী নেতারা বলল, 'হে শুআইব! আমরা অবশ্যই তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দিব অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসতে হবে।' তিনি বললেন, 'যদিও আমরা সেটাকে ঘৃণা করি তবুও? তোমাদের ধর্মাদর্শ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে উদ্ধার করার পর যদি আমরা তাতে ফিরে যাই তবে তো আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করব। আর আমাদের রব্ব আল্লাহ ইচ্ছা না করলে তাতে ফিরে যাওয়া আমাদের জন্য সমীচীন নয়। সবকিছুই আমাদের রবের জ্ঞানের সীমায় রয়েছে, আমরা আল্লাহর ওপরই নির্ভর করি। হে আমাদের রব্ব! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে ফয়সালা করে দিন এবং আপনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী'।" *[সূরা আল-আরাফ: ৮৮-৮৯]*

> অনুরূপ আল্লাহর বাণী, "আর কাফিররা তাদের রাসূলদেরকে বলেছিল, আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে অবশ্যই বহিষ্কৃত করব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসবে। অতঃপর রাসূলগণকে তাদের রব্ব ওহি পাঠালেন, 'যালিমদেরকে আমি অবশ্যই বিনাশ করব'।" *[সূরা ইবরাহীম: ১৩]*

> অনুরূপ "অতঃপর ইবরাহীমের ওপর লূত বিশ্বাস করলেন।" *[সূরা আল-আনকাবূত: ২৬]*

এ মতটি দলীল-প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণিত। *আরো দেখুন. [মাজমূ ফাতাওয়া (১৫/৩০, ৩১), (১০/৩১০), (১৫/২৯); অনুরূপ ইবন হাযম, আল-ফাসলু (৪/৫৮)]* এ মতটিই গ্রহণ করতে হবে, নতুবা বহু আয়াত ও হাদীসের অপব্যাখ্যা করতে হবে। *[ইবন তাইমিয়্যাহ, তাফসীরু আয়াতিন আশকালাত আলা কাসীরিন মিনান নাসি...]*

খ. নবুওয়াতের পরে নবি-রাসূলগণ কি সকল গুনাহ থেকে মাসুম? এ ব্যাপারে দুটি মত প্রসিদ্ধ:

» সকল প্রকার গুনাহ থেকে মাসুম। এ মতের পক্ষেই গিয়েছে আশায়িরা, মাতুরিদিয়্যাহ ও যাহিরিয়্যাহ সম্প্রদায়।

» সকল প্রকার গুনাহ থেকে মুক্ত হওয়া জরুরি নয়। তাদের দ্বারা তার বিপরীতটি ঘটতে পারে। তবে নিকৃষ্ট কোনো কাজ, যা ঘৃণার উদ্রেক করে তা থেকে তারা নিরাপদ ছিলেন। এটিই হচ্ছে অধিকাংশ আলিমের মত। *[ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ ফাতাওয়া (১০/২৯৩); আর-রাদ্দু আলাল বিকরি (১/৩০৬)]* এ মতটিই গ্রহণ করতে হবে, নতুবা কুরআন ও হাদীসের বহু ভাষ্যকে অযথা তাওয়ীল কিংবা তাহরীফ করতে হবে। *[ইবন তাইমিয়্যাহ, তাফসীরু আয়াতিন আশকালাত আলা কাসিরীন মিনান নাস...]*

এতক্ষণ যা আলোচিত হলো তা দ্বারা বোঝা গেল যে, ইসমাত বা নিরাপত্তা কেবল নবি-রাসূলগণের জন্য নির্দিষ্ট। এর বাইরে শিয়া-রাফিজিদের দাবি করা ইসমাত অসার। অনুরূপভাবে সূফিদের দ্বারা ওলীদের ইসমাত দাবি করাও মিথ্যা দাবির অন্তর্ভুক্ত।

২৭. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

“

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, ইসলামে যা কুফর হিসেবে স্পষ্টভাবে এসেছে তা ব্যতীত মানুষকে কাফির হিসেবে বিধান দেওয়া।[৪১]

”

টীকা-৪১

তাকফীর অর্থ কাউকে কাফির ঘোষণা করা। তাকফীর একটি শরঈ বিধান। তা প্রয়োগ করার জন্য অবশ্যই শরীআতের নিয়মে আসতে হবে। তাকফীর বা বা কাউকে কাফির বলা মারাত্মক বিষয়। এ ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফগণ সাবধান করেছেন। যেমন,

১. আল্লাহ তাআলা বলেন,

> “হে মুমিনগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে যাত্রা করবে তখন যাচাই-বাছাই করে নিবে এবং কেউ তোমাদেরকে সালাম করলে ইহজীবনের সম্পদের আশায় তাকে বলো না, ‘তুমি মুমিন নও’; কারণ আল্লাহর কাছে অনায়াসলভ্য সম্পদ প্রচুর রয়েছে। তোমরা তো আগে এরূপই ছিলে, তারপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন; কাজেই তোমরা যাচাই-বাছাই করে নিবে। নিশ্চয় তোমরা যা করো আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।” *[সূরা আন-নিসা: ৯৪]*

২. আল্লাহ তাআলা বলেন,

> “হে ঈমানদারগণ! যদি কোনো ফাসিক তোমাদের কাছে কোনো বার্তা নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখ, এ আশঙ্কায় যে, অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়কে আক্রমণ করে বসবে, ফলে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হবে।” *[সূরা আল-হুজুরাত: ০৬]*

৩. আল্লাহ তাআলা বলেন,

> “হে ঈমানদারগণ! কোনো মুমিন সম্প্রদায় যেন অপর কোনো মুমিন সম্প্রদায়কে উপহাস না করে; কেননা যাদেরকে উপহাস করা হচ্ছে তারা উপহাসকারীদের চেয়ে উত্তম হতে পারে এবং নারীরা যেন অন্য নারীদেরকে উপহাস না করে; কেননা যাদেরকে উপহাস করা হচ্ছে তারা উপহাসকারিণীদের চেয়ে উত্তম হতে পারে। আর তোমরা একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অন্যকে মন্দ নামে

> ডেকো না; ঈমানের পর মন্দ নাম অতি নিকৃষ্ট। আর যারা তাওবা করে না, তারাই তো যালিম।" *[সূরা আল-হুজুরাত: ১১]*

৪. আল্লাহ তাআলা বলেন,

> "হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হতে দূরে থাক; কারণ কোনো কোনো অনুমান পাপ এবং তোমরা একে অন্যের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অন্যের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে করো। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।" *[সূরা আল-হুজুরাত: ১২]*

৫. আল্লাহ তাআলা বলেন,

> "আর যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না। কান, চোখ, হৃদয়- এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।" *[সূরা আল-ইসরা: ৩৬]*

৬. নবি ﷺ বলেন,

> "যখন কোনো মানুষ তার ভাইকে কাফির বলে তখন তাদের দুজনের একজনকে সেটা পেয়ে বসে।" *[মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ৬১০৩]*

৭. নবি ﷺ আরো বলেন,

> "কোনো ব্যক্তি যদি অপরকে কুফরির দিকে সম্পৃক্ত করে অথবা বলল, হে আল্লাহর শত্রু! আর সে বাস্তবে তা না হয়, তাহলে সেটা তার ওপর প্রত্যাবর্তন করবে।" *[মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ৬১]*

৮. নবি ﷺ বলেন,

> "কোনো মানুষ যদি অন্যকে ফাসিক ডাকে, কিন্তু কাফির ডাকেনি, তারপরও তা তার দিকে ফিরে আসবে যদি সে ব্যক্তি অনুরূপ না হয়।" *[বুখারি, আল-জামিউস সহীহ, হা. ৬০৪৫]*

৯- নবি ﷺ আরো বলেন,

> "যে-কেউ মুমিনকে লা'নত করবে সে যেন তাকে হত্যা করল, আর যে-কেউ কোনো মুমিনকে কুফরির অপবাদ দিলো, সেও যেন তাকে হত্যা করল।" *[বুখারি, আল-জামিউস সহীহ, হা. ৬০৪৭]*

১০. এক লোক জাবির ইবন আবদুল্লাহ رضي الله عنه-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কি কিবলার অনুসারী কাউকে মুশরিক বলেন? জবাবে তিনি বলেন, আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। তিনি ভীত হয়ে গেলেন, লোকটি বলল, তাদের কাউকে কি আপনারা কাফির বলেন? তিনি জবাবে বললেন: না। *[আবু ইয়ালা, আল-মুসনাদ, হা. ২৩১৭, সহীহ সনদে]*

১১. ইয়াযীদ আর-রাক্কাশি رحمه الله আনাস ইবন মালিক رضي الله عنه-কে বলেন, হে আবু হামযাহ! কিছু লোক আমাদের ওপর কুফর ও শির্কের সাক্ষ্য দিচ্ছে। তিনি বললেন, 'তারা নিকৃষ্ট সৃষ্টি ও জীব'। *[মারওয়াযি, তা'যীমু কাদরিস সালাত: ৯০০]*

❑ যেসব কারণে সালাফগণ তাকফীর থেকে দূরে থাকতেন:

সালাফগণ যে কারণে তাকফীর থেকে দূরে থাকতেন তা হচ্ছে,

১. সালাফগণ সকল গুনাহকেই কাফির হওয়ার কারণ মনে করতেন না। এ ব্যাপারে যারা সালাফগণের বিরোধিতা করে তারা হচ্ছে খারিজি, রাফিজি ও মুতাযিলা সম্প্রদায়। কারণ তাদের নিকট কবীরা গুনাহকারী কাফির হয়ে যায়।

   পক্ষান্তরে সালাফগণ সকল কবীরা গুনাহ দ্বারা কাউকে কাফির বলেন না। তাদের কাছে এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ পর্যায়ের গুনাহ শির্ক, কুফর ও নিফাকে কেউ পতিত হলেই তাকে কাফির বলা যাবে।

২. সালাফগণ নির্দিষ্ট তাকফীর এবং অনির্দিষ্ট তাকফীরের মধ্যে পার্থক্য করেন।

৩. নির্দিষ্ট তাকফীরের ক্ষেত্রে শর্ত পূরণ ও বাঁধা দূরীকরণ না হওয়া পর্যন্ত কাউকে কাফির বলেন না।

৪. সালাফগণ নির্দিষ্ট কাউকে তাকফীর করলেও সেখানে তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কাজের মধ্যে পার্থক্য করেন। অপ্রকাশ্য কাজ দিয়ে কাউকে তাকফীর করেন না।

❑ অনির্দিষ্টভাবে তাকফীর:

সালাফগণ অনির্দিষ্টভাবে কোন কোন আকীদাহ, আমল বা কথার মাধ্যমে কাফির হয় তা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যেমন,

১. অন্তর থেকে আসা যেসব কথা কাফির বানিয়ে দেয়:

» মুখে ঈমান আনতে অস্বীকার করা।

» দীনের মধ্যে যা হারাম তা হালাল বলা অথবা যা হালাল তা হারাম বলা।

» আল্লাহর কোনো বিধানে কিংবা কোনো সংবাদে সন্দেহ প্রকাশ করা।

» নবি ﷺ-এর অনুসরণ করা লাগবে না বলা।

» তাওহীদ বিষয়ে মুখের যেসব কথায় কাফির হয়ে যায়:

১. তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ অস্বীকার করলে।

২. তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত অস্বীকার করলে।

৩. তাওহীদুল ইবাদাত অস্বীকার করলে।

» নবুওয়াত বিষয়ে যা মুখে অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যায়:

১. নবিদের মানতে অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যাবে।

২. আমাদের নবিকে মানতে অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যাবে।

৩. নবুওয়াতের দাবি করলে কাফির হয়ে যাবে।

» অন্যান্য গায়িবি বিষয়ে যা মুখে অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যায়:

১. আল্লাহর কিতাবসমূহ ও তাঁর বাণী অস্বীকার করা।

২. ফিরিশতাদের অস্বীকার করা।

৩. জিনদের অস্বীকার করা।

৪. আখিরাতের সাব্যস্ত কোনো বিষয় অস্বীকার করা।

» মুখে তাকদীর অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যাবে।

২. অন্তর থেকে হওয়া কাজসমূহ যা কাউকে কাফির বানিয়ে দেয়:

» আল্লাহর দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা, তা না শিক্ষা দেওয়া আর না তা শিক্ষা নেওয়া।

» আকীদাগত মুনাফিকি। আর তার অধিকাংশই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। *[ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-ঈমানুল আওসাত, পৃ. ১৮১, আল-ঈমান ২৮৫]* আর সেটা বিভিন্নভাবে হতে পারে:

১. রাসূলের ওপর মিথ্যারোপ।

২. রাসূল যা নিয়ে এসেছেন তার কিছুর ওপর মিথ্যারোপ।

৩. রাসূলের সঙ্গে শত্রুতা করা।

৪. রাসূল যা নিয়ে এসেছেন তার সঙ্গে শত্রুতা করা।

৫. রাসূলের দীনের পতনে খুশি হওয়া ও রাসূলের দীনের উন্নতি অপছন্দ হওয়া।

৬. রাসূল যা কিছুর সংবাদ দিয়েছেন সেটার সত্যায়ন করতে হবে বলে বিশ্বাস না করা।

৭. রাসূল যা নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করতে হবে বলে বিশ্বাস না করা।

৮. রাসূল যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত হওয়া লাগবে না বলে বিশ্বাস করা।

৯. রাসূলের আনীত শরীআত মানতে বাধ্য নয় বলে বিশ্বাস করা বা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা।

১০. রাসূলকে কষ্ট দেওয়া ও দোষত্রুটি বের করা, অপমান করা।

১১. রাসূলের দীনের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সাহায্য করা।

১২. রাসূলের অনুসারীদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা। *[দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ ফাতাওয়া (২৮/৪৩৪); মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহহাব, মাজমুআতুত তাওহীদ, পৃ. ৭]*

- অন্তর থেকে অস্বীকার, অহংকার ও অমান্য করা।
- অন্তরের আমলের বড়ো শির্কসমূহ। যেমন,
  ১. আল্লাহর ভালোবাসায় শির্ক।
  ২. নিয়্যত, ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যে শির্ক।
  ৩. ভয়, আশা, তাওয়াক্কুল ইত্যাদিতে শির্ক।

৩. **কর্মের মাধ্যমে কাফির হওয়া। এর বহু সুরত রয়েছে। যেমন,**

- ইবাদাতে শির্ক করা।
- আল্লাহর বিধান ব্যতীত ফয়সালা করা ও ফয়সালা গ্রহণ করা।
- আল্লাহর দীন থেকে কার্যত মুখ ফিরিয়ে থাকা।
- কাফিরদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সাহায্য করা।

২৮. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

“

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, মহান আল্লাহর তাওহীদ বিষয়ে অবহেলা করা, তার আলোচনা অন্তরসমূহে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে অমনোযোগী করা।[৪২] কারণ এটিই সেই ভিত্তি যার ওপর প্রত্যেকের মাঝে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে।

”

টীকা-৪২

যার ওপর দীন প্রতিষ্ঠিত তা হচ্ছে তাওহীদ। এর প্রতি গুরুত্ব না দেওয়া ব্যক্তির ঈমানে দৈন্যতার বহিঃপ্রকাশ। অথচ আজকাল অনেক তথাকথিত চিন্তাবিদ ও সুশীল সমাজ এ বিষয়টিকে অবহেলা করে যাচ্ছে। তারা আবার বড়ো বড়ো কথাও আওড়িয়ে যায়, তারা কখনো কখনো ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথাও বলে। কিন্তু তাদের নিজেদের মাঝেও তাওহীদ প্রতিষ্ঠা পায়নি, তাদের অনুসারীদের মাঝে তো দূরের কথা। তাদের অনেকেই তাওহীদ নিয়ে আজেবাজে মন্তব্য করে। এসব প্রমাণ করে যে, তারা সঠিক মানহাজে নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত নবি-রাসূলদের তাওহীদ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি কারো কাছে মুখ্য কাজ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি আলিম বিবেচিত হতে পারেন না। কারণ নবিগণ যে ইলম রেখে গেছেন তার সর্বাগ্রে রয়েছে তাওহীদের ইলম। সুতরাং যারা তাওহীদের গুরুত্ব দিবে তারা নবি-রাসূলদের কাজে আছেন। আর যারা তা করবে না, তারা নবি-রাসূলগণের ওয়ারিশ নন। তারা ভুল পথে আছে এটাই বলতে হবে। কারণ;

১. এ তাওহীদের জন্যই আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন।

> "আর আমি জিন ও মানবকে তো কেবল আমার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছি।" [সূরা আয-যারিআত: ৫৬]

২. এ তাওহীদ হলো কুরআনের প্রথম নির্দেশ।

> "হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই রবের ইবাদাত করো যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও।" [সূরা আল-বাকারাহ: ২১]

৩. এ তাওহীদের জন্যই নবি রাসূলগণকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন।

> "আর আপনার পূর্বে আমরা যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তার কাছে এ ওহিই পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত করো।" [সূরা আল-আম্বিয়া: ২৫]

৪. এ তাওহীদের দিকেই নবিরা তাদের কাওমকে ডেকেছেন।

> "হে আমার জাতি একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোনো মাবূদ নেই।" [সূরা আল-আরাফ: ৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫, সূরা হূদ: ৫০, ৬১, ৮৪; সূরা আল-মু'মিনূন: ২৩, ৩২]

৫. নবিরা সবাই এ দাওয়াত দিয়েই শুরু করেছেন। আমাদের নবিও তা করেছেন। তিনি মক্কার বাজারে বাজারে ঘুরে ঘুরে বলতেন,

> "তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো, সফলকাম হতে পারবে"। [আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা. ১৬০২২]

৬. এ তাওহীদের জন্যই তিনি মক্কার প্রথম দশটি বছর নিগৃহীত হয়েছেন। তখন আর কোনো ফরয ছিল না।

৭. এ তাওহীদের জন্যই নবিগণ জিহাদ করেছেন।

> "আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যতক্ষণ না তারা বলছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ...।" [বুখারি, আল-জামিউস সহীহ, হা. ২৫, ১৩৯৯; মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ২০]

৮. এ তাওহীদের জন্যই সাহাবায়ে কিরাম হিজরত করতে বাধ্য হয়েছেন।

৯. এ তাওহীদের জন্যই ঈমানদার ও কাফির মানুষ দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে।

১০. এ তাওহীদ সর্বাগ্রে দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ মুআয ইবন জাবাল رضي الله عنه-কে নির্দেশ দিয়েছেন। [বুখারি, আল-জামিউস সহীহ, হা. ৭৩৭২]

১১. এ তাওহীদের জন্যই জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> "যার সর্বশেষ কথা হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" [আবু দাউদ, আস-সুনান, হা. ৩১১৬]

এসব কারণ ও অন্যান্য কারণে তাওহীদের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি দিতে হবে। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে যখন তাওহীদের পরিচয় মানুষের কাছে বিভিন্ন

রকম হয়ে গেছে। যেমন,

» কারো কারো কাছে তাওহীদ হচ্ছে এমন এক সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া যার কোনো নাম, গুণ ও কর্ম নেই।

» কারো কারো কাছে তাওহীদ হচ্ছে, এমন এক সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা যার নাম আছে কিন্তু গুণ ও কর্ম নেই।

» কারো কারো কাছে তাওহীদ হচ্ছে, এমন এক সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা যার নাম আছে কর্ম আছে গুণ নেই।

» কারো কারো কাছে তাওহীদ হচ্ছে, শুধু আল্লাহর রুবুবিয়াত সাব্যস্ত করা, বা সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাঁর জন্য সাব্যস্ত করা।

» কারো কারো কাছে তাওহীদ হচ্ছে, শুধু আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করা।

» কারো কারো কাছে তাওহীদ হচ্ছে, আল্লাহ নামের যিকির করা।

এমতাবস্থায় নবি-রাসূলগণের তাওহীদ তুলে ধরা প্রতিটি মানুষের ওপর প্রতিটি মুহূর্তে কর্তব্য। যে দাওয়াতে কখনো বলার সুযোগ নেই যে অনেক হয়েছে।

২৯. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

“

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, দাওয়াতের মূল বিষয় হয়ে যাবে ‘সম্পদ বণ্টন’, চাই তা অর্থনৈতিক সংস্কারের নামে হোক বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের নামে হোক অথবা রাজনৈতিক সংস্কারের নামে হোক।[৪৩]

”

টীকা-৪৩

❑ রাজনৈতিক অপকৌশল:

সাধারণত বর্তমান কালে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের প্রথম অস্ত্র হচ্ছে জনগণকে এ দাবির মাধ্যমে কাছে টানা। কারণ মানুষের মাঝে দুনিয়াপ্রীতি, সম্পদের প্রতি মোহ চিরন্তন। তাদেরকে অন্য কিছু দিয়ে একত্রিত করা যত কঠিন, ইনসাফ, সাম্য, মানবাধিকার, সম্পদের সুষম বন্টন ইত্যাদি কথাগুলোর মাধ্যমে নিজের দলে ভেড়ানো খুবই সহজ। এগুলো খুবই চটকদার কিছু ইস্যু। অথচ আমরা জানি যে, যদি তাওহীদ ও রিসালাত যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এগুলো এমনিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এগুলোর আলাদা আন্দোলন করার প্রয়োজন হবে না।

যুগে যুগে যারা রাষ্ট্র ও সরকার পরিবর্তনের চেষ্টা করেছে তারা জনগণের মাঝে এগুলো তুলে ধরেছে। এমনকী ইসলামের প্রথম ফিতনা, যা উসমান ﵁'র বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল, তাতেও বাগী সম্প্রদায় এসব রব উচ্চারণ করেছিল। পরবর্তীকালে প্রতিটি সাম্রাজ্যের ধ্বংস ও অপরটির প্রতিষ্ঠায় এসব কথা ও দাবি সহজাত হিসেবে মানুষ গ্রহণ করেছিল। কখনো আমাদের সালাফগণ এ জাতীয় কোনো জাহিলি দাবি তুলেননি; কারণ তারা জানতেন মূল সমস্যা এখানে নয়, মূল সমস্যা হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা। সেটা ঠিক হলে এসব ঠিক হওয়া মুহূর্তের ব্যাপার। কারণ যখন ইসলামি রাষ্ট্র তার সঠিক নিয়মে চলেছিল তখন এগুলোর কোনো কিছুর দাবি উঠাতে হয়নি। অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল যে, সেখানে যাকাত গ্রহণ করার লোকও দৃষ্টিগোচর হয়নি। সুতরাং মূল সমস্যার দিকে নজর না দিয়ে এসব পার্শ্বচিন্তার মাধ্যমে কখনো কোনো লাভ অর্জিত হবে না। যদিও তা অবিবেচক মানুষের মাঝে উন্মাদনা তৈরি করতে সক্ষম হয়।

৩০. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

“

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, মুসলিম শাসক ও মুসলিম জামাআতের দায়িত্বপ্রাপ্ত লোক ব্যতীত অন্যদের কাছে বাইআত বা আনুগত্যের শপথ করা।[৪৪]

”

টীকা-৪৪

বস্তুত বাইআত একটি শরঈ পরিভাষা। এর ব্যবহারের ক্ষেত্রেও শরীআতের নির্দেশনা মেনে চলা উচিত।

বাইআত হলো, এমন একপ্রকার চুক্তি যা দুপক্ষের মধ্যে সংঘটিত হয়। শাব্দিক অর্থ বেচাকেনা করা। মনে হয় প্রত্যেক পক্ষ তার কাছে যা আছে তা অপর পক্ষের কাছে বিক্রি করে, তার নিজের পক্ষ থেকে নিষ্ঠা সহকারে তা প্রদান করেছে বলেই বাইআত নামকরণ করা হয়েছে।

❑ **বাইআত-এর প্রকারভেদ:**

রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েক প্রকার বাইআত নিয়েছেন:

১. **ইসলাম ও তাওহীদের ওপর বাইআত:** এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা যারা নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের থেকে গ্রহণ করতেন।

> "হে নবি! মুমিন নারীগণ যখন আপনার কাছে এসে বাইআত করে এ মর্মে যে, তারা আল্লাহর সঙ্গে কোনো শরীক স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা সজ্ঞানে কোনো অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সংকাজে আপনাকে অমান্য করবে না, তখন আপনি তাদের বাইআত গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" *[সূরা আল-মুমতাহিনাহ: ১২]*

এটা কেবল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। পরবর্তী কেউই তা আর গ্রহণ করেননি।

২. **সাহায্য-সহযোগিতা ও প্রতিরোধ করার ওপর বাইআত:** রাসূলুল্লাহ ﷺ এটি মদীনাবাসীদের থেকে নিয়েছেন। *[আকাবার দ্বিতীয় বাইআত ছিল, যাতে ৭৩ জন আনসার ছিল। আহমাদ, আল-মুসনাদ (২৫/৮৯), নং ১৫৭৯৮]* এ বাইআত রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল মদীনাবাসীদের থেকে নিয়েছেন। মক্কাবাসী বা অন্য কোনো দেশের লোকদের থেকে তা নেওয়া হয়নি। এটি নেওয়ার অধিকার রাসূলুল্লাহ ﷺ ছাড়া আর কারো নেই। কারণ তিনি মাসুম, তার সহযোগিতা

ও তার পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করা ফরয। যা করতে প্রতিটি মুসলিম বাধ্য। রাসূল ﷺ- এর পরে পরবর্তী কেউ এমন করেছেন বলে নজির নেই। তার ওপর কিয়াস করে যারাই এ রকমের কিছু দাবি করবে তারা হয় বিদআতি, না হয় জাহিল।

৩. **জিহাদের ওপর বাইআত:** কুরআন ও সুন্নাহয় তা অনেক জায়গায় এসেছে। যার মূলকথা হচ্ছে মৃত্যু পর্যন্ত জিহাদ করা। যেমন,

> "নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে তাদের জন্য আছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, অতঃপর তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে এ সম্পর্কে তাদের হক ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কে আছে? সুতরাং তোমরা যে সওদা করেছ সে সওদার জন্য আনন্দিত হও। আর সেটাই তো মহাসাফল্য।" *[সূরা আত-তাওবাহ: ১১১]*

> তদ্রূপ "নিশ্চয় যারা আপনার কাছে বাইআত করে তারা তো আল্লাহরই হাতে বাইআত করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। তারপর যে তা ভঙ্গ করে, তা ভঙ্গ করার পরিণাম বর্তাবে তারই ওপর এবং যে আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, তবে তিনি অবশ্যই তাকে মহাপুরস্কার দেন।" *[সূরা আল-ফাতহ: ১০]*

> অনুরূপ "অবশ্যই আল্লাহ মুমিনগণের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার কাছে বাইআত গ্রহণ করেছিল। অতঃপর তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি জেনে নিয়েছেন। ফলে তিনি তাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয়ে পুরস্কৃত করলেন।" *[সূরা আল-ফাতহ: ১৮]*

এটা নেওয়ার অধিকারও একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ছিল। তার পরবর্তী কোথায় তা হয়েছে বলা হলেও সেটা রাষ্ট্রপ্রধানের নিযুক্ত প্রতিনিধির হাতে হয়েছে। রাষ্ট্রীয় শক্তির বাইরে কারো জন্য এ বাইআত নেওয়ার অধিকার নেই।

৪. **হিজরতের ওপর বাইআত:** যা ইসলামের প্রাথমিক সময়ে যারাই ইসলাম গ্রহণ করত তাদের থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ গ্রহণ করতেন। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'মক্কা-বিজয়ের পর বাইআত নেই'। অর্থাৎ মক্কা থেকে আর হিজরত নেই, সুতরাং সে বাইআতও আর অবশিষ্ট নেই।

৫. **শোনা ও আনুগত্যের বাইআত:** রাসূলুল্লাহ ﷺ তা রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তারপর খলীফাগণ গ্রহণ করেছেন। রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে বর্তমানে যারা 'নব্য গণতন্ত্র' দ্বারা প্রভাবিত হয়নি তারা এখনো তা গ্রহণ করেন। যেমন, সৌদি আরবের বাদশাহ, মরক্কোর বাদশাহ, জর্দানের বাদশাহ প্রমুখ।

বর্তমানে বাইআত বলা হলে এ বাইআতই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

» **এ বাইআতের কিছু শর্ত আলিমগণ বলেছেন:**

১. তার ওপর মানুষের ঐক্য হওয়া।

২. তার রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার শর্ত পূরণ করা।

৩. সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তার হাতে বাইআত করা।

❑ **এ বাইআতের বিভিন্ন বিধান:**

১. এটি ফরযে কিফায়া, কিছু মানুষ করলেই তা আদায় হয়ে যাবে।

২. একক ব্যক্তির হাতে হবে বা তার প্রতিনিধির হাতে হবে।

৩. বাইআত অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে বিশেষ লোকদের দ্বারা, তারপর সাধারণ বাইআতে সকলে অংশীদার হবে।

৪. রাষ্ট্রপ্রধান ছাড়া অন্য কারো হাতে বাইআত করা বিদআত। এগুলো মতভেদকে আরো বাড়িয়ে তোলার মাধ্যম। *[শাইখ সালিহ আল-ফাওযান, আল-মুন্তাকা মিন ফাতাওয়া (১/৩৬৭)]*

৫. বাইআত পুরুষদের মধ্যে মুসাফাহার মাধ্যমে অথবা কথার মাধ্যমে হবে অথবা লিখিত মাধ্যমে হবে। যেমনটি নাজ্জাশি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে চিঠি লিখে করেছিলেন। আর নারীদের থেকে কথার মাধ্যমে এমনকী

তাদেরও লেখার মাধ্যমে হতে পারে। কোনোক্রমেই তাদের হাত ধরার মাধ্যমে হবে না।

৬. যেসব হাদীসে বলা হয়েছে,

> "যে-কেউ মারা যাবে অথচ তার ঘাড়ে বাইআত নেই, তার মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যু।" *[মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ১৮৫১।]*

> অনুরূপ "যে-কেউ কোনো শাসকের হাতে বাইআত হয়ে তাকে হাতের ওয়াদা করেছে ও অন্তরের ফল দিয়েছে, সে যেন তার আনুগত্য করে যতটুকু সম্ভব, যদি অন্য কেউ সেখানে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসে তবে যেন অপর জনের গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হয়।" *[মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ১৮৪৪।]*

> তদ্রূপ অপর হাদীস "যদি দুজন খলীফার বাইআত করা হয়, তবে তোমরা পরবর্তী জনকে হত্যা করো।" *[মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ১৮৫৩]*

এসব হাদীস সবই রাষ্ট্র ও সরকারের জন্য। এগুলো স্পষ্ট। তন্মধ্যে প্রথম হাদীসটির অর্থ রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য বর্ণনা করা। দল ও সংগঠনের লোকদের দ্বারা বাইআত তৈরি করা নয়। বিষয়টি স্পষ্ট। অজ্ঞতার কারণে দলীয় সংগঠন কিংবা তথাকথিত পীরশ্রেণি এ ধরনের বাইআতের পিছনে ছুটে চলেছে।

তাহলে আমাদের কাছে স্পষ্ট হলো যে, বাইআত শুধু মুসলিম ক্ষমতাধর শাসকের অধিকার। তিনি যেভাবেই ক্ষমতায় আসুন না কেন, তার বাইআত ওয়াজিব হয়ে যায়। তবে শর্ত হচ্ছে, তিনি অবশ্যই এর জন্য যোগ্য হবেন। যেমন ঈমানদার হবেন, পুরুষ হবেন, শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ হবেন। এসব শর্ত পাওয়া গেলে আনুগত্যের বাইআত নেওয়া ওয়াজিব। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসে এসেছে, "যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ তার ঘাড়ে বাইআত নেই, তার মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যু।" এখানে একটি কথা বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে, এ হাদীস কেবল তখন প্রযোজ্য হবে যখন গ্রহণযোগ্য শাসক পাওয়া যাবে এবং তিনি বাইআত বা আনুগত্যের আহ্বান জানাবেন। কিন্তু যদি কোনো শাসক পাওয়া না যায় তখন তাদের মৃত্যু 'জাহিলিয়াতের মৃত্যু'

হচ্ছে এটা বলা যাবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্দেশ্য ইমাম থাকলে যেন কেউ জাহিলি যুগের মতো কর্ম না করে, যেখানে কেউ কারো কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব মানতো না, পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত থাকত।

তাই যদি কোথাও শর্ত পূরণ করে এমন শাসক না পাওয়া যায় তখন তারা যদি নিজেদের মধ্যে সৎভাবে চলতে পারে তবে সেটা অবশ্যই যথেষ্ট হয়ে যাবে। তখন কোনো বাইআত তৈরি করা যাবে না। কারণ,

> রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান প্রশ্ন করেছিলেন, যদি কোনো শাসক ও মুসলিম জামাআত না থাকে তখন কী করব? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, তাহলে সকল দল থেকে নিজেকে আলাদা রাখবে, যদিও গাছের মূলে কামড় দিয়ে থাকতে হয়, যতক্ষণ না তোমার মৃত্যু আসছে, আর তুমি তার ওপর থাকলে। *[বুখারি, আল-জামিউস সহীহ, হা. ৩৬০৬]*

দেখা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কৃত্রিম বাইআত তৈরি করতে বলেননি। সুতরাং যদি শাসক থাকে আর তিনি বাইআতের আহ্বান জানান তবেই বাইআত করতে হবে, তখন শর্ত পূরণ করার পরও বাইআত না করলে গুনাহগার হবে, নতুবা নয়। আর এ বাইআত শুধু একজনের জন্যই হবে, অর্থাৎ শাসকের জন্যই হবে, কয়েক জনের জন্য নয়। আগেই বলেছি যে, এ বাইআত শরঈ পরিভাষা, যেখানে সেখানে তা ব্যবহৃত হতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলিমরা ভালো কাজের জন্য, যেমন দাওয়াত, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজে নিষেধ ইত্যাদিতে একতাবদ্ধ হতে বা সংগঠিত হতে পারবে না?

উত্তর: আলিমগণ এ ধরনের সংগঠিত হওয়াকে শর্তসাপেক্ষে জায়িয বলেছেন। যেমন,

১. এর জন্য পূর্বোল্লিখিত শাসকের বাইআত হতে পারবে না।

২. এ চুক্তির যিনি নেতৃত্ব দিবেন তিনি নিজেকে মুসলিমদের শাসকের

পর্যায়ে মনে করতে পারবেন না। যেসব জিনিস শাসকের সঙ্গে জড়িত সেগুলো করতে পারবেন না। যেমন, যাকাত আদায়, শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা, বিচারক নিয়োগ, শাসক নিয়োগ ইত্যাদি।

৩. এর ওপর 'ওয়ালা' (বন্ধুত্ব) ও 'বারা' (বৈরিতা) নীতি নির্ভর করতে পারবে না। অর্থাৎ তাদের সঙ্গে কেউ না থাকলে বা একমত না হলে তার শত্রুতা করা কিংবা তাদের সঙ্গে থাকলেই তার সঙ্গে মিত্রতা করার নীতি প্রয়োগ করা যাবে না।

৪. যারা তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়নি, অথচ তারাও অন্যান্য ভালো কাজ করছে তাদের থেকে নিজেদেরকে ভালো বা শ্রেষ্ঠ মনে করতে পারবে না।

৫. শুধু নিজেদের পরিচয়ের জন্য অন্য নাম ব্যবহার করতে পারবে, কিন্তু অন্য নাম দিয়ে মুসলিমদের জামাআত থেকে ভালো অবস্থানে আছে এমনটি বোঝানোর জন্য নতুন নাম ব্যবহার জায়িয নেই।

৬. তাদের সঙ্গে যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে একাত্মতার ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হয়, পরে তিনি কোনো কারণে তাদের সঙ্গে না থাকে তবে সেটাকে মুসলিম শাসকের বাইআত ভঙ্গ করার গুনাহগার বলতে পারবে না।

৭. তাদের সঙ্গে যুক্ত থাকলে অন্য কারো সঙ্গে ভালো কাজে যুক্ত হতে পারবে না, এমন কিছু থাকতে পারবে না।

৮. এ প্রকার কাজ করার জন্য যদি চুক্তিবদ্ধতা বা অঙ্গীকারাবদ্ধতার প্রয়োজন দেখা না দেয় তবে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো যাবে না।

৯. কারো ওপর যদি রাষ্ট্রীয় বাইআত থাকে, তবে এ ধরনের কোনো চুক্তি সে রাষ্ট্রীয় বাইআত-এর বিরোধী বা তার সঙ্গে সংঘর্ষপূর্ণ হতে পারবে না।

১০. এ জাতীয় অঙ্গীকার শরঈ কাঠামোর মধ্যে হতে হবে। শরীআত বিরোধী যত চুক্তি সব বাতিল হবে, শত চুক্তি হলেও।

১১. এ ব্যাপারে অঙ্গীকারকে বাইআত বলা যাবে না। শাইখ ইবন বায ﷺ ১১/০৪/১৪১৮ হিজরিতে হজের সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আলিমগণকে এ ব্যাপারে নসীহত করেন যেন তারা এ কাজকে বাইআত নাম না দেয়, বরং তারা যেন আকদ বা আহদ এমন নাম প্রদান করে।

১২. এ ধরনের অঙ্গীকার এর ক্ষেত্রে 'আমৃত্যু' যোগ করা যাবে কিনা এ ব্যাপারে দ্বিমত আছে। অধিকাংশ আলিম তা জায়িয মনে করেন না।

৩১. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

"এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ-অনুকরণ ত্যাগ করা। আল্লাহ্ তাঁর দেওয়া সম্মান বৃদ্ধি করুন ও তাকে নিরাপত্তা দান করুন।[৪৫]"

টীকা-৪৫

মুসলিম হওয়ার জন্য শর্তই হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ ও অনুকরণ করা। সেখানে যদি কারো সামান্যতম অবজ্ঞা বা অবহেলা আসে তবে সে মুসলিম থাকতে পারবে না। কারণ কুরআনে কারীমে ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসে এটিকে কঠিনভাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন,

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

আল্লাহ বলেন, "কেউ রাসূলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল, আর কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে আপনাকে তো আমরা তাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠাইনি।" *[সূরা আন-নিসা: ৮০]*

আরো বলেন, "বলুন, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমাকে অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।" *[সূরা আলে ইমরান: ৩১]*

আল্লাহ বলেন, "রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো; নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।" *[সূরা আল-হাশর: ০৭]*

তিনি আরো বলেন, "কিন্তু না, আপনার রবের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার আপনার ওপর অর্পণ না করে; অতঃপর আপনার মীমাংসা সম্পর্কে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।" *[সূরা আন-নিসা: ৬৫]*

তিনি আরো বলেন, "মুমিনদের উক্তি তো এই- যখন তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়, তখন তারা বলে, 'আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম।' আর তারাই সফলকাম।" *[সূরা আন-নূর: ৫১]*

আল্লাহ বলেন, "বলুন, 'তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো।' তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদেরকে পছন্দ করেন না।" *[সূরা আলে ইমরান: ৩২]*

তিনি আরো বলেন, "আর তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো, যাতে তোমরা কৃপা লাভ করতে পার।" *[সূরা আলে ইমরান: ১৩২]*

তিনি আরো বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো, আরো আনুগত্য করো তোমাদের মধ্যকার ক্ষমতাশীলদের, অতঃপর কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত করো আল্লাহ ও রাসূলের নিকট, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান এনে থাক। এ পন্থাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।" *[সূরা আন-নিসা: ৫৯]*

তিনি আরো বলেন, "আর তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো। আর সাবধানতা অবলম্বন করো; তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখ যে, আমাদের রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টভাবে প্রচার করা।" *[সূরা আল-মায়িদাহ: ৯২, সূরা আন-নূর: ৫৪]*

তিনি আরো বলেন, "বল, হে মানুষ, আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল, যার রয়েছে আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব। তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন ও তার প্রেরিত উম্মী নবির প্রতি, যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহের প্রতি ঈমান রাখে। আর তোমরা তার অনুসরণ করো, আশা করা যায়, তোমরা হিদায়াত লাভ করবে।" *[সূরা আল-আরাফ: ১৫৭]*

তিনি আরো বলেন, "আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, যদি তোমরা মুমিন হও।" *[সূরা আল-আনফাল: ০১]*

তিনি আরো বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের

আনুগত্য করো এবং তোমরা যখন তাঁর কথা শোন তখন তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিও না।" [সূরা আল-আনফাল: ২০, সূরা আল-আনফাল: ৪৬]

তিনি আরো বলেন, "আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু, তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে, সালাত কায়িম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে; তারাই, যাদেরকে আল্লাহ অচিরেই দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা আত-তাওবাহ: ৭১]

তিনি আরো বলেন, "আর তারা বলে, 'আমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনলাম এবং আমরা আনুগত্য করেছি।' এর পর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়; আসলে তারা মুমিন নয়।" [সূরা আন-নূর: ৪৭]

তিনি আরো বলেন, "আর যে-কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করে, তাহলে তারাই কৃতকার্য।" [সূরা আন-নূর: ৫২]

তিনি আরো বলেন, "আর তোমরা সালাত কায়িম করো, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য করো, যাতে তোমাদের ওপর রহমত করা যায়।" [সূরা আন-নূর: ৫৬]

তিনি আরো বলেন, "আর তোমরা নিজ ঘরে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন জাহিলি যুগের প্রদর্শনীর মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। আর তোমরা সালাত কায়িম করো, যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাক। হে নবি-পরিবার! আল্লাহ তো শুধু চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।" [সূরা আল-আহযাব: ৩৩]

তিনি আরো বলেন, "যেদিন তাদের মুখমণ্ডল আগুনে উলট-পালট করা হবে, সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহকে মানতাম আর রাসূলকে মানতাম!" [সূরা আল-আহযাব: ৬৬]

তিনি আরো বলেন, "তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।" [সূরা আল-আহযাব: ৭১]

তিনি আরো বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো, আর তোমরা তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করো না।" [সূরা মুহাম্মাদ: ৩৩]

তিনি আরো বলেন, "তখন তোমরা সালাত কায়িম করো, যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। আর তোমরা যা আমল করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।" [সূরা আল-মুজাদালা: ১৩]

তিনি আরো বলেন, "সুতরাং তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো, শ্রবণ করো, আনুগত্য করো এবং ব্যয় করো তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণের জন্য; আর যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়; তারাই তো সফলকাম।" [সূরা আত-তাগাবুন: ১৬]

তিনি আরো বলেন, "এসব আল্লাহ নির্ধারিত সীমা। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করলে আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; তারা সেখানে স্থায়ী হবে আর এটাই হলো মহা সাফল্য।" [সূরা আন-নিসা: ১৩]

তিনি আরো বলেন, "আর কেউ আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করলে সে নবি, সিদ্দীক (সত্যনিষ্ঠ), শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ- যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন- তাদের সঙ্গী হবে এবং তারা কত উত্তম সঙ্গী!" [সূরা আন-নিসা: ৬৯]

৩২. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

“

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, বিদআতিদের দিকে ঝুঁকে যাওয়া ও তাদের সম্মান করা।[৪৬]

”

টীকা-৪৬

বিদআতিদের ব্যাপারে ইতঃপূর্বে [মানহাজ নং-১৪] আলোচনা চলে গেছে। এখানে একটি মাসআলা নিয়ে আলোচনা হতে পারে, তা হচ্ছে, বিদআতিদের সঙ্গে আহলুস সুন্নাহর আচরণ কেমন হবে?

বস্তুত বিদআতির প্রকারভেদ অনুসারে তার সঙ্গে আচরণ করতে হবে। তার আগে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, সব বিদআতিরা এক ধরনের নয়। তাদের মধ্যে আছে,

১. জাহিল মুকাল্লিদ।

২. হক ও হিদায়াত তালাশ থেকে বিমুখ, দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত।

৩. হক প্রকাশ হয়েছে তার কাছে, কিন্তু সে তাকলীদ (অন্ধ অনুসরণ) ও তাআসসুব (গোঁড়ামি) করে হক গ্রহণ করছে না।

৪. হক প্রকাশ পেয়েছে তার কাছে, কিন্তু হকের বাহকের সঙ্গে শত্রুতা বা ঘৃণা থাকার কারণে হক গ্রহণ করছে না।

৫. বিদআতের দিকে আহ্বানকারী।

৬. বিদআত নিয়ে সে নিজেকে গোপন করে রেখেছে।

এসব অবস্থায় সকলের সঙ্গে সমান আচরণ করা যাবে না।

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, বিদআতিদের মধ্যে যারা ইসলামে আছে তারা কয়েক প্রকার:

১. জাহিল মুকাল্লিদ, যার কোনো দূরদৃষ্টি নেই, তাকে কাফির বলা যাবে না, ফাসিক বলা যাবে না, তার সাক্ষ্যও প্রত্যাখ্যান করা যাবে না।

২. যারা প্রশ্ন করতে পারে ও হিদায়াত গ্রহণ করার মতো প্রচেষ্টা চালাতে পারে, কিন্তু দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে তা গ্রহণে উদ্যমী হয় না। এ ব্যক্তি গুনাহগার, তার ওপর শরঈ ধমকি প্রযোজ্য, তার বিধান ফরয তরককারীদের বিধানের মতো।

৩. যারা প্রশ্ন করে হক জেনে নেওয়ার পরও তাকলীদ বা তাআসসুব এর কারণে গ্রহণ করে না বা দাঈদের সঙ্গে শত্রুতার কারণে গ্রহণ করে না, তার সর্বনিম্ন অবস্থা হলো ফাসিক। [ইবনুল কাইয়িম, আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ, পৃ. ২০৪]

☐ এসব অবস্থায় তাদের সঙ্গে শরীআতসম্মত দাওয়াতের ব্যাবস্থা করতে হবে। তার পদ্ধতি নিম্নরূপ:

১. কখনো হিকমতের সঙ্গে, কখনো উত্তম উপদেশের সঙ্গে, কখনো কোমলতার সঙ্গে। যেমনটি ইমাম আহমাদ করতেন।

২. কখনো তাদের সঙ্গে উত্তম বিতর্ক করবেন প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য, যেমনটি ইবন আব্বাস ﷺ খারিজিদের সঙ্গে করেছেন।

৩. কখনো তাদের সঙ্গে মুনাযারা করা, তাদের সঙ্গে বসা থেকে নিষেধ করার মাধ্যমে, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার মাধ্যমে, তাদের কথা শোনা থেকে নিষেধ করার মাধ্যমে। যখন তাদের সঙ্গে বসা, সম্পর্ক রক্ষার মধ্যে আর স্বার্থ নেই বোঝা যাবে অথবা তাদের ক্ষতিকর দিকগুলো স্পষ্ট হয়ে যাবে। সালাফে সালিহীন এ অবস্থাতেই তাদের সঙ্গে বসা, তাদের কথা শোনা, তাদের সঙ্গে বিতর্ক করা, তাদের কাছে যাওয়া থেকে নিষেধ করেছেন।

এগুলো দাঈদের জন্য সর্বোচ্চ কাজ।

৪. তাদের ক্ষতিকে নিরোধ করার জন্য তাদের দমন করা, জেল, বেত্রাঘাত, এমনকী যদি হত্যা পর্যন্ত করতে হয় তবে সেটাও করা যাবে, যখন তাদের ক্ষতি অনেক মারাত্মক আকার ধারণ করে। যেমনটি উমার ﷺ সাবীগ ইবন ইসল-এর সঙ্গে করেছেন, যেমনটি আলি ﷺ সাবায়িদের সঙ্গে করেছেন, যেমনটি পরবর্তী শাসকরা করেছেন, গাইলান আদ-দিমাশকি, জাদ ইবন দিরহাম, জাহম ইবন সাফওয়ান, হুসাইন ইবন মানসূর হাল্লাজ, সাহরাওয়ার্দি আল-মাকতুল-এর সঙ্গে। তবে এসব শাসকের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

দাঈদের জন্য জন্য সর্বোচ্চ কাজ হচ্ছে তৃতীয়টি। তারা সেটা অবস্থা অনুসারে ব্যবহার করবেন। যখন সেটার উপযোগ্যতা না দেখবেন তখন তা করা থেকে থেকে বিরত থাকবেন। কিন্তু যদি সেটা উপকারী বিবেচিত হয় তখন অবশ্যই সেটা করবেন। তাদের সঙ্গে বসলে যেসব সমস্যা দেখা দেয় তা মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে, যেমন,

এক. তার অন্তরে বিদআতকে সুন্দর করে তুলতে পারে।

দুই. তার অন্তরকে রোগগ্রস্ত করে দিতে পারে, ফলে তার মাঝে আর বিদআতের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার সাহস থাকবে না।

তিন. তার অন্তরকে বিদআতের দিকে টেনে নিতে পারে।

চার. তার অন্তরে বিদআতিদের সঙ্গে আচরণে নমনীয়তা ও মেনে নেওয়ার প্রবণতা তৈরি করতে পারে।

☐ এসব কারণে আমাদের সালাফ থেকে তাদের সঙ্গে বসার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে প্রচুর ভাষ্য এসেছে, যেমন,

১. হাসান বসরি ﷺ বলেন, প্রবৃত্তির অনুসারীর সঙ্গে বসবে না, কারণ এর কারণে তোমার অন্তরে সে এমন কিছু ঢেলে দিতে পারে, যার অনুসরণের কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে, অথবা তার বিরোধিতা কারণে তোমার অন্তর রোগগ্রস্ত হবে।

২. তিনি আরো বলেন, বিদআতির সঙ্গে বসবে না; কারণ তা তোমার অন্তরকে ব্যাধিগ্রস্ত করবে।

৩. আবু কিলাবা ﷺ বলেন, প্রবৃত্তির অনুসারীদের সঙ্গে বসবে না, তাদের সঙ্গে বিতর্ক করবে না; কারণ আমি এটা থেকে নিরাপদ নই যে, সে তোমাকে তাদের পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত করবে না অথবা তোমরা যা জানো সেটাতে সংশয় তৈরি করবে না।

৪. তিনি আরো বলেন, প্রবৃত্তির অনুসারীরা পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়, জাহান্নাম ব্যতীত তাদের আর কোনো ঠিকানা আমি দেখি না।

৫. আইয়্যুব আস-সাখতিয়ানী ﷺ বলেন, বিদআতি যত বেশি জোশের সঙ্গে ইবাদাত করবে তত বেশি আল্লাহ থেকে দূরে সরে যাবে, এজন্য তিনি বিদআতিদের খারিজি বলতেন। তিনি বলতেন, এরা নামে কমবেশ হলেও কর্মে একই পর্যায়ের।

৬. ইয়াহইয়া ইবন আবি কাসীর ﷺ বলেন, যদি বিদআতিদের তুমি দেখবে এক রাস্তা দিয়ে চলতে তাহলে তুমি অন্য রাস্তা গ্রহণ করবে।

এসব হচ্ছে সালাফগণের বিদআতিদের সঙ্গে বসার ব্যাপারে সালাফগণের বক্তব্য। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এসব অবশ্যই দাওয়াতের স্বার্থ বিবেচনা করেই করতে হবে। যদি দাঈ ব্যক্তি এমন কোনো ব্যক্তিত্ব হয়, যিনি বিদআতিদের পরিত্যাগ করলে সেটার দ্বারা সে দীনের দিকে ফিরে আসবে বা সাধারণ জনসাধারণ সেটার দ্বারা সাবধান হয়ে তার থেকে দূরে থাকবে, তাহলে এটাকে কার্যকর করতে হবে। কিন্তু যদি দাঈ এমন ব্যক্তি হয়, যিনি খুব বেশি ইলমে প্রসিদ্ধ নন, অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা তার রয়েছে তখনও তিনি নিজেকে বাঁচাতে বিদআতিদের সঙ্গে বসা ত্যাগ করবেন। আর যদি দাঈ ব্যক্তি এমন হয়, যিনি তাদের সন্দেহের উত্তর দিতে সক্ষম, আর বিদআতিরাও এমন হয়, যাদের সত্য গ্রহণ করার মতো প্রবণতা লক্ষণীয়, তবে তাদের সঙ্গে বসে তাদেরকে হকের দিকে আহ্বান করতে পারবেন, অন্য কোনো কারণে বসতে পারবেন না।

এতো গেল বিদআতিদের সঙ্গে বসার ব্যাপারে সালাফগণের দৃষ্টিভঙ্গি।

কিন্তু বিদআতিদের প্রতি ঝুঁকে যাওয়া, তাদের বিদআতকে সহনীয় করে নেওয়া এটা মারাত্মক অপরাধের কাজ।

❑ এ ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ, সালাফগণের বাণী অনেক। যেমন,

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> "আপনি পাবেন না আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ঈমানদার এমন কোনো সম্প্রদায়, যারা ভালোবাসে তাদেরকে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে- হোক না এ বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা এদের জ্ঞাতি-গোত্র। এদের অন্তরে আল্লাহ লিখে দিয়েছেন ঈমান এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা। আর তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে; আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর দলই সফলকাম।" *[সূরা আল-মুজাদালাহ: ২২]*

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> "আর যারা যুলুম করেছে তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না; পড়লে আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে। এ অবস্থায় আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। তারপর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না।" *[সূরা হূদ: ১১৩]*

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

> "আর আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, যারা আমাদের আয়াতসমূহ সম্বন্ধে উপহাসমূলক আলোচনায় মগ্ন হয়, তখন আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন, যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গ শুরু করে। আর শয়তান যদি আপনাকে ভুলিয়ে দেয় তবে স্মরণ হওয়ার পর যালিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে বসবেন না।" *[সূরা আল-আনআম: ৬৮]*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> "মানুষ যাকে ভালোবাসবে তার সঙ্গে হাশর হবে।" *[বুখারি, আল-জামিউস সহীহ, হা. ৬১৬৮; মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ২৬৪০]*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> "একজন মানুষ তার বন্ধুর দীনের ওপর থাকে।" [আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা. ৮০২৮; আবু দাউদ, আস-সুনান, হা. ৪৮৩৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> "মানবাত্মাসমূহ যুদ্ধবাহিনীর যোদ্ধাদের মতো, পরিচিত হলে মিল হয়, অপরিচিত হলে বেমিল হয়।" [বুখারি, আল-জামিউস সহীহ, হা. ৩৩৩৬; মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ২৬৩৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> "উত্তম সঙ্গীসাথি ও খারাপ সঙ্গীসাথির উদাহরণ হচ্ছে আতর বহনকারী ও অঙ্গার বহনকারীর মতো। আতরবহনকারী হয় সেটা তোমাকে তা দিবে অথবা তার থেকে কিনবে, বা তার থেকে উত্তম সুগন্ধি পাবে, অন্য দিকে অঙ্গার বহনকারী সে হয় তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দিবে অথবা তার থেকে দুর্গন্ধ পাবে।" [বুখারি, আল-জামিউস সহীহ, হা. ৫৫৩৪; মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ২৬২৮]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> "অচিরেই আমার উম্মাতের শেষের লোকদের মধ্যে এমনসব লোক হবে যারা তোমাদেরকে এমনসব হাদীস শোনাবে, যা তোমরা কোনোদিন শোনোনি, তোমাদের বাপদাদারাও শোনেনি। সুতরাং তোমরা তখন তাদের থেকে সাবধান থাকবে, তারাও যেন তোমাদের থেকে সাবধানে থাকে।" [মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ৬]

তাছাড়া আলিমগণের মাঝে ইজমা হয়েছে বিদআতিদের পরিত্যাগ করার ব্যাপারে। ইমাম বাগাওয়ি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'সাহাবায়ে কেরাম, তাবিয়ি ও তাদের অনুসারীরা এ ব্যাপারে একমত যে, বিদআতিদের সঙ্গে শত্রুতা থাকতে হবে ও তাদের বয়কট করতে হবে।' [শারহুস সুন্নাহ (১/২২৭)]

অনুরূপভাবে যুগ যুগ ধরে সালাফি আলিমগণ এ বিষয়টি সাব্যস্ত করে গেছেন। যেমন,

» ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'তোমরা প্রবৃত্তিপূজারীদের সঙ্গে বসো না; কারণ তাদের সঙ্গে বসার অর্থ অন্তরকে ব্যাধিগ্রস্ত করা।' [লালেকাঈ, শারহু উসূলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ (২/৪৩৮)]

» ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'অতঃপর যখন তুমি তাদের (তাকদীর অস্বীকারকারী বিদআতিদের) কারো সাক্ষাৎ পাবে তখন তাদের জানিয়ে দিবে যে, আমি তাদের থেকে মুক্ত, তারাও আমার থেকে মুক্ত।' [মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ৮]

» আবদুল্লাহ আর-রূমি রহিমাহুল্লাহ বলেন, এক লোক আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু'র কাছে এল, আমি তখন তার কাছে। সে বলল, হে আবু হামযা! আমি কিছু মানুষকে পেয়েছি, যারা শাফাআত অস্বীকার করে ও কবরের আযাব স্বীকার করে না। তখন তিনি বললেন, 'এরাই মিথ্যাবাদী, তাদের সঙ্গে বসবে না।' [ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (২/৪৪৮)]

» ইবন আউন রহিমাহুল্লাহ বলেন, মুহাম্মাদ ইবন সীরীন-এ মত পোষণ করতেন যে, যারা প্রবৃত্তিপূজারী তারা অতি তাড়াতাড়ি মুরতাদ হয়ে যায়, তিনি আরো মনে করতেন, 'আর যখন আপনি তাদের দেখবেন যারা আমার আয়াতসমূহ নিয়ে অযথা বিতর্ক করছে', এ আয়াত তাদের ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে। [ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (২/৪৩১)]

» ইবন সীরীন রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি যখন বিদআতিদের থেকে কোনো বাক্য শুনতেন তখন তাঁর দুআঙুল কানে ঢুকিয়ে নিতেন, তারপর বলতেন, তার সঙ্গে কথা বলা আমার জন্য জায়িয নেই, যতক্ষণ না সে মজলিস থেকে উঠে যেতো ততক্ষণ এ রকমই থাকতেন। [ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (২/৪৭৩)]

» এক লোক ইবন সীরীন ﷺ-কে বললেন, অমুক আপনার বৈঠকে আসতে চায়, তবে সে আপনার সঙ্গে কথা বলবে না, তারপরও তাকে আসার অনুমতি দিবেন? তখন ইবন সীরীন বলেন, তাকে বলো হে অমুক, সে যেন না আসে; কারণ আদম সন্তানের অন্তর দুর্বল। আমার আশঙ্কা হয় তার থেকে এমন কোনো বাক্য শুনবো তখন আর আমার অন্তর আগের অবস্থায় ফিরে আসবে না। *[ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (২/৪৪৬)]*

» তাউস ও তালক ইবন হাবীব বসা ছিলেন, এমন সময় প্রবৃত্তির অনুসারী বিদআতি এক লোক এসে বলল, 'আমাকে কি বসার অনুমতি দেওয়া যাবে? তাউস বললেন, 'তুমি যদি বস তো আমরা উঠে চলে যাব।' *[ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (২/৪৪৭)]*

» মামার ﷺ বলেন, ইবন তাউস ﷺ বসা ছিলেন, তখন সেখানে মুতাযিলা এক লোক প্রবেশ করে কথা বলতে আরম্ভ করল, মামার বলেন, তখন ইবন তাউস তার আঙুল কানে ঢুকিয়ে নিলেন, আর তার সন্তানকে বললেন, প্রিয় বৎস, তুমিও তোমার কানে আঙুল ঢুকিয়ে নাও, আর শক্তভাবে ধরে রাখ, তার কথার বিন্দু বিসর্গ যেন তোমার কানে না ঢুকে।' *[ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (২/৪৪৬)]*

» ইবনুল মুবারাক ﷺ বলেন, বিদআতির চেহারা অন্ধকার থাকবে, যদিও তার চেহারায় প্রতিদিন ত্রিশ বার তৈল মর্দন করে।' *[লালেকাঈ, শারহু উসূলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ (১/১৫৯), আসার নং ২৮৪]*

» ইবনুল মুবারাক ﷺ আরো বলেন, 'আল্লাহ তাআলা বিদআতিদের থেকে তাওবাকে অন্তরাল করেছেন।' *[আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ, ১৬২০]*

» আওযাঈ ﷺ বলেন, 'হে মুসলিমরা তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো, কল্যাণকামীদের নসীহত গ্রহণ করো, ওয়াজকারীদের ওয়াজ শুনে যাও। জেনে রাখ, এ ইলম হচ্ছে দীন, তাই ভালো করে দেখ কী করছ, কার থেকে তা গ্রহণ করছ, কার অনুসরণ করে চলেছ, কাকে তোমাদের দীনের ব্যাপারে আমানতদার মনে করছ; কারণ বিদআতিরা সকলেই বাতিলপন্থি, চরম মিথ্যাবাদী, অপরাধী, সামান্যতম ভয়ও তাদের নেই, কারো কোনো খেয়াল তারা রাখে না, তাদের সামান্যতম তাকওয়াবোধ নেই।... সুতরাং তোমরা তাদের থেকে সাবধান থাকবে, তাদের ব্যাপারে সন্দেহে থাকবে, তাদেরকে পরিত্যাগকারী হবে, তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখবে। কারণ তোমাদের পূর্ববর্তী আলিমগণ আর পরবর্তী যারা সঠিক পথে ছিলেন, তারাও তাই করত ও করার নির্দেশ দিত।' *[ইবন আসাকির, তারীখে দিমাশক (৬/৩৬২)]*

» ইমাম ফুদাইল ইবন ইয়াদ ﷺ বলেন, 'আল্লাহর কিছু ফিরিশতা রয়েছেন, যারা তাঁর যিকির বা আলোচনার বৈঠকগুলো খুঁজে বেড়ায়, সুতরাং তুমি দেখ কার সঙ্গে তোমার বসা হচ্ছে, বিদআতিদের সঙ্গে বসো না; কারণ আল্লাহ তাআলা তাদের দিকে তাকান না। আর মুনাফিকির আলামত হচ্ছে, একজন মানুষ নিজে গিয়ে বিদআতিদের সঙ্গে বসবে, আমি উত্তম লোক যা দেখেছি তারা সবাই সুন্নাহ এর অনুসারী, তারা সবাই বিদআতিদের থেকে নিষেধ করত।' *[আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া (৮/১০৪)]*

তিনি আরো বলেন, "বিদআতির সঙ্গে বসো না; কারণ আমি ভয় পাই যে তোমার ওপর লা'নত নাযিল হবে।" *[ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (২/৪৬০)]*

তিনি আরো বলেন, 'যে-কেউ বিদআতিকে ভালোবাসবে আল্লাহ তার আমল বরবাদ করে দিবেন, তার অন্তর থেকে ইসলামের নূর বের করে দিবেন।' *[ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (২/৪৬০)]*

তিনি আরো বলেন, 'আমি ইয়াহূদি ও নাসারার সঙ্গে খাবার খাই, কিন্তু বিদআতির সঙ্গে খাই না; আমি পছন্দ করি আমার মাঝে ও বিদআতির মাঝে লোহার একটি দুর্গ থাকুক। *[ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (২/৪৬০)]*

» এক বিদআতি লোক আইয়্যুব আস-সাখতিয়ানি ﷺ-কে বললেন, হে বকরের পিতা! আপনাকে একটি বাক্য জিজ্ঞাসা করতে চাই, তিনি কানে আঙুল দিয়ে থাকলেন এবং বললেন, এক বাক্যের অর্ধেকও নয়, একটি বাক্যের অর্ধেকও নয়।

» আবু হাতিম ইবন হিব্বান ﵀ উপরিউক্ত উত্তম সঙ্গী ও খারাপ সঙ্গীর হাদীস বর্ণনা করার পর বলেন, 'বুদ্ধিমান সর্বদা ভালো লোকের সাহচর্য গ্রহণ করে, খারাপ লোকের সঙ্গ ত্যাগ করে; কারণ ভালো লোকের সঙ্গে ভালোবাসা দ্রুত সম্পন্ন হয় দেরিতে কর্তিত হয়, আর খারাপ লোকের সঙ্গে সম্পর্ক অতি দেরিতে সম্পন্ন হয়, কিন্তু দ্রুত কর্তিত হয়। তাছাড়া খারাপ লোকের সঙ্গী হলো ভালো লোকদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা তৈরি হয়। আর যে-কেউ খারাপ লোকদের গোপনে মিলিত হয় সে তাদের মধ্যে ঢুকে যাওয়া থেকে নিরাপদ হয় না। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তির ওপর কর্তব্য হচ্ছে, সন্দেহজনক লোকদের সংসর্গ পরিত্যাগ করা, যাতে সে নিজে সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে পড়ে। যেভাবে ভালো লোকদের সাথি হলে কল্যাণ লাভ করা যায়, তেমনি খারাপ লোকদের সাথি হলে অকল্যাণই অর্জিত হয়। *[রাওদাতুল উকালা ৯৯-১০৩]*

ইবন বাত্তাহ ﵀ সালাফগণের থেকে অনেকগুলো ভাষ্য এনেছেন, যার সব এখানে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। যা দ্বারা এটাই সাব্যস্ত হয় যে, যখন বিদআতিরা খুব সমস্যা সৃষ্টি করবে তখন তাদের সঙ্গে উঠবস করা পরিত্যাগ করতে হবে, তাদের দিকে ঝুঁকে যাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না।

আর বিদআতিদের সম্মান করার বিষয়টি আরো মারাত্মক। ইমাম আহমাদ বলেন, যখন কোনো লোক বিদআতিকে সালাম করে, বোঝা যাবে সে তাকে ভালোবাসলো। *[আবু ইয়ালা, তাবাকাতুল হানাবিলাহ (১/১৯৬)]*

এজন্য ফুদাইল ইবন ইয়াদ ﵀ বলেন, যে-কেউ বিদআতিকে সম্মান করল সে তো ইসলামকে বিনষ্ট করার কাজে সহযোগিতা করল। যে-কেউ বিদআতির মুখে মুচকি হাসল, সে তো আল্লাহ যা আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর নাযিল করেছে তার অপমান করল। যে-কেউ তার কন্যাকে বিদআতির কাছে বিয়ে দিলো, সে তো আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করল। যে-কেউ বিদআতির জানাযার পিছু নিলো সে যতক্ষণ ফিরে না আসছে ততক্ষণ আল্লাহর গযবে থাকল। *[বারবাহারি, শারহুস সুন্নাহ, পৃ. ১৩৯]*

বিদআতিদের কাছে বসলে, তাদের প্রতি ঝুঁকলে কী সমস্যা হয়, তার নমুনা হচ্ছে সাহাবি ও তাবিয়িদের বংশধরদের অনেকেই মুতাযিলা হয়ে গিয়েছিল যখন তারা আমর ইবন উবাইদের কাছে বসেছিল।

ইমরান ইবন হিত্তান খারিজি এক নারীকে বিয়ে করেছিল এ নিয়্যতে যে তাকে আহলুস সুন্নাহ বানাবে, পরে নিজেই খারিজি হয়ে গেল।

আবু যর আল-হারওয়ি যিনি ইমাম বুখারির হাদীসের বর্ণনাকারী, তিনি বাকিল্লানির সঙ্গে বসার পরে আশআরি হয়ে গেল।

বাইহাকি ﵀ ইবন ফুওরাকের সঙ্গে বসার কারণে আশআরি মতবাদের অনেক কিছু মেনে নিয়েছিলেন।

বর্তমানেও অনেকেই স্ত্রীর কারণে খারিজি হয়ে যাচ্ছে, যা অনেকের কাছেই স্পষ্ট।

৩৩.

এটা সালাফগণের
মানহাজ নয়!

“

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে,
সব ধরনের অজ্ঞতাকে অজুহাত হিসেবে পেশ করা। বরং তাঁরা তখনই অজ্ঞতাকে কারণ হিসেবে পেশ করতেন, যখন ইলম অর্জনে পূর্ণ উদ্যমে শ্রম দিয়ে এবং সে ক্ষেত্রে কোনোরূপ কমতি না রাখার পরও, নিজের থেকে যতটুকু সম্ভব প্রকাশের পর, ইলমের সেই পর্যায়ে না পৌঁছতে পারেন।

বরং সালাফগণ কেবল অজ্ঞতার অজুহাত গ্রহণ করেছেন ঐ ব্যক্তির জন্য যিনি জ্ঞান শেখার এবং অন্বেষণে তাঁর প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন এবং এক্ষেত্রে ন্যূনতম কসুর করেননি এবং যা কিছু তার কাছ থেকে এসেছে তা তার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে এসেছে।

”

৩৪.

এটা সালাফগণের
মানহাজ নয়!

“

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে,
ইলম অর্জনের পূর্বেই আমল করা,
তারা (সালাফগণ) তো আমলের পূর্বে
ইলম অর্জন শুরু করতেন।

আল্লাহ বলেন,

> অতএব জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তুমি ক্ষমা চাও তোমার ও মুমিন নারী-পুরুষদের ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য।
>
> —[সূরা মুহাম্মাদ: ১৯]

”

৩৫.

এটা সালাফগণের **মানহাজ নয়!**

“

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, অতিরিক্ত কথা বলা ও বক্তব্য দেওয়া, এর পরিবর্তে তারা বলতেন; “যে বেশি কথা বলবে, সেই বেশি ভুল করবে” এবং তারা নীরবতা অবলম্বন করতেন; এমনকী মনে করা হতো যে, তিনি (মনে হয় সে বিষয়ে) এ বিষয়ে সুন্দর করে বক্তব্য দিতে অক্ষম, যদিও এটা সত্য নয়, বরং তারা আল্লাহর ভয়ে নীরবতা অবলম্বন করতেন।

”

৩৬.

এটা সালাফগণের **মানহাজ নয়!**

“

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, ইলম অনুযায়ী আমল সম্পাদন ছেড়ে দেওয়া; কারণ বর্ণিত হয়েছে: ‘ইলম তার দিকে আমলের আহ্বান করে, যদি ইলমের আহ্বানে আমল সাড়া দেয় তো ভালো, নতুবা তা বিদায় নিবে।’

”

৩৭.

এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

“

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, বাতিলপন্থিদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া; কারণ প্রকৃতপক্ষে একজন মুসলিম তার দীনকে বিবিধ প্রবৃত্তির শিকারে পরিণত করে না।’[৪৭]

”

টীকা-৪৭

বিতর্কের ব্যাপারে মূলনীতি হলো তা নিন্দিত; বহু আয়াতে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল তা থেকে নিষেধ করেছেন। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহর কোনো কোনো ভাষ্যে কিছু বিতর্ককে অনুমোদন করা হয়েছে। তাই আমরা বলতে পারি যে, বিতর্ক দু প্রকার:

এক. নন্দিত বিতর্ক। আর তা হবে দুটি সময়ে।

ক. যখন সেটা ‘আহসান’ বা সর্বোত্তম পদ্ধতিতে হবে।

> আল্লাহ তাআলা বলেন, “আপনি মানুষকে দাওয়াত দিন আপনার রবের পথে হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সঙ্গে তর্ক করবেন উত্তম পন্থায়। নিশ্চয় আপনার রব্ব, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয়েছে, সে সম্বন্ধে তিনি বেশি জানেন এবং কারা সৎপথে আছে তাও তিনি ভালোভাবেই জানেন।” *[সূরা আন-নাহল: ১২৫]*

> আরো বলেন, “আর তোমরা উত্তমপন্থা ছাড়া কিতাবীদের সঙ্গে বিতর্ক করবে না, তবে তাদের সঙ্গে করতে পার, যারা তাদের মধ্যে যুলুম করেছে। আর তোমরা বল, ‘আমাদের প্রতি এবং তোমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে, তাতে আমরা ঈমান এনেছি। আর আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ তো একই। আর আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী’।” *[সূরা আল-আনকাবূত: ৪৬]*

খ. যখন সেটা ‘ইলম’ বা জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে হবে।

> আল্লাহ তাআলা বলেন, “সাবধান, তোমরা তো সেসব লোক, যে বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞান আছে সে বিষয়ে তোমরা তর্ক করেছ, তবে যে বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কেন তর্ক করছ? আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না।” *[সূরা আলে ইমরান: ৬৬]*

❑ এ বিতর্কের জন্য যেসব শর্ত রয়েছে তা হচ্ছে,

১. যখন জানা যাবে যে বিতর্ককারী হক অস্বীকৃতি ও প্রবৃত্তির তাড়না থেকে মুক্ত হওয়ার আশা রয়েছে। কিন্তু যদি দেখা যায় সে অমান্যকারী হবে, অহংকারী হবে, তখন তার সঙ্গে বিতর্ক করা নিন্দিত হবে। কারণ,

> আল্লাহ বলেন, "তবে তাদের মধ্যে যারা যালিম হবে।" [সূরা আল-আনকাবূত: ৪৬]

অর্থাৎ তখন আর তাদের সঙ্গে তর্ক করতে যেও না। তখন তাদের সঙ্গে তরবারির মাধ্যমে যুদ্ধ হবে। [জালালাইন, পৃ. ৫২৭]

২. বিতর্ক কোমল ও নরমভাবে হবে, অহংকার ও গর্ব করার জন্য নয়। নতুবা সেটা নিন্দিত হবে।

৩. যখন সে বিতর্কের বিষয়ে ইলম ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন গভীর জ্ঞানের মাধ্যমে করা হবে। নতুবা তা নিন্দিত হবে। যেমনটি ইতঃপূর্বে সূরা আলে ইমরানের ৬৬নং আয়াতে এসেছে।

৪. যখন সেটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবান বিষয়ে হবে, যেটা আলোচনা করলে উপকারিতা আসবে। এটি তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঐ বাণীর অধীন হবে যেখানে তিনি বলেছেন, 'তোমরা মুশরিকদের সঙ্গে জিহাদ করো সম্পদ, জান ও জিহ্বা দিয়ে'। [আবূ দাউদ, আস-সুনান, হা. ২৫০৪]

৫. মৌলিক কোনো বিষয়ে বিতর্ক সীমাবদ্ধ থাকবে, অন্য দিকে চলে না যাবে। যেমনটি আল্লাহ বলেছেন,

> "তবে যদি হয় সেটি প্রকাশ্য বিবাদ।" [সূরা আল-কাহফ: ২২]

এসব শর্ত পাওয়া গেলে কেবল বিতর্ক করা যাবে উল্লিখিত আয়াতের আলোকে।

দুই. নিন্দিত বিতর্ক। আর তা তখন হবে, যখন:

ক) তা হবে সেসব লোকদের সঙ্গে, যাদের নিকট হকের চেয়ে নিজের মতকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা বেশি।

খ) যারা প্রবৃত্তিপূজারী; বিতর্কের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়।

গ) যারা অন্ধ মুকাল্লিদ হিসেবে গোঁড়ামিতে প্রসিদ্ধ।

ঘ) যার পরিণতি আরো মারাত্মক হবে।

ঙ) যেখানে বিতর্ককারী জাহিল হবে।

চ) যেখানে বিতর্কের বিষয় কোনো শরীআতের ভাষ্যের বিপরীতে হয়।

ছ) একাধিক ব্যক্তি একজনের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হবে।

জ) বিতর্ককারী যখন কথাবার্তায়, অপমানে ও গালিগালাজে পটু হবে; কিন্তু প্রমাণ উপস্থাপনে দুর্বল হবে।

এ বিতর্ক নিষিদ্ধ; যদি বাতিলপন্থিদের সঙ্গে হয়, বিশেষ করে যাদের ব্যাপারে জানা যাবে যে তারা বাতিলকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নেমেছে, তখন তাদের সঙ্গে বিতর্কে যাওয়া উচিত নয়। কুরআন, হাদীস, সাহাবায়ে কিরামের ভাষ্য ও ইমামগণের বক্তৃতায় তা উঠে এসেছে। যেমন,

> আল্লাহ তাআলা বলেন, "আল্লাহর আয়াতসমূহে বিতর্ক কেবল তারাই করে যারা কুফরি করেছে; কাজেই দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন আপনাকে ধোঁকায় না ফেলে।" [সূরা গাফির: ০৪]

> আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, "যারা নিজেদের কাছে (তাদের দাবির সমর্থনে) কোনো দলীল-প্রমাণ না আসলেও আল্লাহর নিদর্শনাবলি সম্পর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়। তাদের এ কাজ আল্লাহ ও মুমিনদের দৃষ্টিতে খুবই ঘৃণার যোগ্য। এভাবে আল্লাহ মোহর করে দেন প্রত্যেক অহংকারী, স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়ে।" [সূরা গাফির: ৩৫]

> আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, "নিশ্চয় যারা নিজেদের কাছে কোনো দলীল না থাকলেও আল্লাহর নিদর্শনাবলি সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদের অন্তরে আছে শুধু অহংকার, তারা এ ব্যাপারে সফলকাম হবে না। অতএব আপনি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চান; নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" [সূরা গাফির: ৫৬]

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার হাদীসে বলেন,

> "যখনই কোনো জাতি হিদায়াতের পরে পথভ্রষ্টতায় চলে যায় তখন তাদেরকে বিতর্ক প্রদান করা হয়"। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াত পাঠ করলেন, 'তারা তো কেবল ঝগড়ার জন্যই তাকে (ঈসাকে) পেশ করছে, তারা তো ঝগড়াটে জাতি।' *[সূরা আয-যুখরুফ: ৫৮]*

তাছাড়া নবি ﷺ আরো বলেন,

> "নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত লোক হচ্ছে ভীষণ ঝগড়াটে লোক।" *[বুখারি, আল-জামিউস সহীহ, হা. ৪৫২৩; মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ২৬৬৮]*

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> "যে-কেউ বাতিল নিয়ে বিতর্ক করবে, যে জানে যে তা বাতিল, সে সর্বদা আল্লাহর অসন্তুষ্টির মধ্যে থাকবে যতক্ষণ না তা ত্যাগ করছে।" *[আবু দাউদ, আস-সুনান, হা. ৩৫৯৭, সহীহ সনদে]*

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন,

> "কুরআন পড়ো এমন করে যা তোমাদের অন্তরে মিল-মুহাব্বাত তৈরি করবে, যখন দেখবে মতভেদ শুরু হয়ে গেছে তখনই তা থেকে উঠে চলে যাবে।" *[বুখারি, আল-জামিউস সহীহ, হা. ৫০৬০; ৫০৬১; মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ২৬৬৭]*

আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস ﷺ বলেন,

> একদিন দুপুরবেলা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম, দেখলাম, দুজন লোক একটি আয়াত নিয়ে বিতর্ক করছে, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে বের হয়ে এলেন, তখন তাঁর চেহারায় ক্রোধ দেখা যাচ্ছিল, তিনি বললেন, 'তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতরা তাদের কিতাব নিয়ে মতভেদে লিপ্ত হওয়ার কারণে ধ্বংস হয়েছে।' *[মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ২৬৬৬]*

অন্য হাদীসে এসেছে,

> রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে দেখলেন সাহাবিগণ তাকদীর নিয়ে ঝগড়া করছেন, তখন যেন রাসূলের চেহারায় ডালিমের দানা বিনষ্ট করে দেওয়া হয়েছে এমন রাগ করলেন, তারপর তিনি বললেন, এটার জন্যই কি তোমরা নির্দেশিত হলে? এর জন্যই কি তোমরা সৃষ্টি হলে? কুরআনের একাংশকে আরেকাংশে ফেলছ? এভাবেই তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছে।' *[ইবন মাজাহ, আস-সুনান, হা. ৮৫, সহীহ]*

এমনকী কোনো কারণে হক তার পক্ষে হলেও বিতর্ক না করলে সাওয়াব দেওয়ার কথা বলেছেন।

> "আমি সে ব্যক্তির জন্য জান্নাতের আঙিনায় একটি ঘরের যামিনদার হলাম, যে তার পক্ষে হক থাকা সত্ত্বেও বিতর্ক করা ছেড়ে দিবে।" *[আবু দাউদ, আস-সুনান, হা. ৪৮০০, সহীহ]*

» ইবন আব্বাস ﷺ বলেন, 'তোমার যুলুমের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তুমি সর্বদা বিতর্কে লেগে থাকবে, আর তোমার গুনাহের জন্য এটাই যথেষ্ট যে তুমি সর্বদা ঝগড়া লাগিয়ে রাখবে।'

» ইবন আব্বাস ﷺ মুআওয়িয়াহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আমার সঙ্গে মুনাযারায় (বিতর্কে) যাবেন সে ব্যাপারে, যাতে আপনি আপনি মনে করছেন আপনি আমার সাথিদের হারিয়ে দিয়েছেন? মুআওয়িয়াহ ﷺ বললেন, সেটা দিয়ে তুমি কী করবে? আমি তোমার বিরুদ্ধে বলবো, তুমি আমার বিরুদ্ধে বলবে, তারপর তোমার অন্তরে এমন কিছু অবশিষ্ট থাকবে যা তোমার কোনো উপকার দিবে না, আর আমার অন্তরে তোমার বিরুদ্ধে এমন কিছু থাকবে যা তোমার ক্ষতি করবে?

» হাসান বসরি ﷺ একদল লোককে বিতর্ক করতে দেখতে পেয়ে বললেন, 'তারা ইবাদাতে বিরক্ত হয়ে গেছে, কথা বলা তাদের কাছে হালকা হয়ে গেছে, তাদের পরহেযগারী কমে গেছে, তাই তারা কথা বলে চলেছে।'

» ইবন আবিয যানাদ ﵀ বলেন, 'বিতর্ক করে কোনো কিছুকে দাঁড় করানো হলেও তা অনুরূপ কিছুকে ভেঙ্গে দেয়।'

» আওযাঈ ﵀ বলেন, 'যখন আল্লাহ কোনো কাওমের অকল্যাণ চান তখন তাদের মাঝে বিতর্ক লাগিয়ে রাখেন, তাদেরকে আমল করা থেকে বিরত রাখেন।

» আসমাঈ ﵀ বলেন, আমি বেদুঈনকে বলতে শুনেছি, যে-কেউ মানুষের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদের সঙ্গে ঝগড়ায় নামে তার সম্মান কমে যায়, আর যে-কেউ তা বেশি করে সেটা দ্বারাই সে প্রসিদ্ধি পায়।

» মুসলিম ইবন ইয়াসার ﵀ বলেন, 'তোমরা বিবাদ থেকে বেঁচে থাক, কারণ তা আলিম ব্যক্তির মূর্খ সময়, এর মাধ্যমে শয়তান তাকে পদস্খলিত করতে চায়।'

» উমার ইবন আবদুল আযীয ﵀ বলেন, 'যে-কেউ তার দীনকে ঝগড়ার জায়গা বানাবে সে অধিক পরিমাণে অবস্থান পালটাতে থাকবে।'

» আবু কিলাবা ﵀ বলতেন, তোমরা প্রবৃত্তিপূজারীদের সঙ্গে বসো না, তাদের সঙ্গে বিতর্ক করো না; কারণ আমি নিরাপদ নই যে, তারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত করবে না অথবা তোমাদের দীনের মাঝে সন্দেহ প্রবেশ করাবে, সেসবের কিছু দিয়ে যাতে তারা সন্দেহে পতিত হয়ে আছে।

» এক লোক হাসান বসরির কাছে এসে বলল, আবু সাঈদ, আপনার সঙ্গে দীনী মুনাযারা (বিতর্ক) করবো, উত্তরে হাসান বললেন, 'আমি আমার দীনের মাঝে চক্ষুষ্মান, ভালো করেই জানি ও বুঝি, যদি তুমি তোমার দীন হারিয়ে ফেলে থাক, তবে তুমি সেটা খুজতে থাক।'

» ইমরান আল-কুসাইর ﵀ বলতেন, তোমরা দীনের মাঝে ঝগড়া ও বিবাদ থেকে বেঁচে থাক, তোমরা তাদের থেকেও বেঁচে থাক, যারা বলে, তুমি কি এটা দেখনি, তুমি কি এটা দেখনি...

» ইমাম মালিক ﵀ বলেন, 'যখনই কোনো লোকের অপর কোনো লোক বিবাদে বেশি পটু হবে, আমরা কি তার বিবাদে জিতে যাওয়ার কারণে আল্লাহ তার নবির ওপর যা নাযিল করেছেন তা ছেড়ে দিব?' *[ইবন মুফলিহ, আল-আদাবুশ শারঈয়্যাহ (১/২০১)]*

» ইমাম মালিক আরো বলেন, ঝগড়া বিবাদ অন্তরকে কঠোর করে দেয়, পরস্পর হিংসা তৈরি করে।

তিনি আরো বলেন, এ বিতর্কগুলো দীনের কোনো অংশ নয়। *[ইবন মুফলিহ, আল-আদাবুশ শারঈয়্যাহ (১/২০১)]*

» ইমাম শাফিয়ি ﵀ বলেন, ইলম নিয়ে বিতর্ক ও বিবাদ অন্তরকে কঠিন করে দেয় ও হিংসা বিদ্বেষের জন্ম দেয়। *[প্রাগুক্ত]*

» ইমাম আহমাদ ﵀ বলেন, 'আকীদার মূলনীতি হচ্ছে, ...প্রবৃত্তিপূজারীদের সঙ্গে না বসা, তাদের সঙ্গে বিতর্ক না করা, দীনের মধ্যে ঝগড়া, বিবাদ ছেড়ে দেওয়া।'

» ইমাম বাগাওয়ি ﵀ বলেন, আহলুস সুন্নাতের সালাফি আলিমগণ একমত যে, সিফাত নিয়ে বিবাদ করা যাবে না, ইলমুল কালাম ও শিক্ষায় প্রবেশ করা যাবে না।

» আইয়ুাব আস-সাখতিয়ানি ﵀ বলেন, আমি যত প্রবৃত্তিপূজারীকে বিতর্ক করতে দেখেছি, তাদেরকে পেয়েছি মুতাশাবাহ (অস্পষ্ট) ভাষ্য নিয়ে বিতর্ক করে।

৩৮.

এটা সালাফগণের
মানহাজ নয়!

❝

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, আলিমদের দিকে প্রত্যাবর্তন পরিত্যাগ করা। বরং তারা (সালাফগণ) মানুষদেরকে আলিমদের সঙ্গে বসার আহ্বান জানাতেন এবং তাঁদের নির্দেশাবলি এবং পরামর্শকে আঁকড়ে ধরতে এবং মেনে চলতে আহ্বান করতেন।

❞

৩৯.

এটা সালাফগণের
মানহাজ নয়!

❝

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, কারো ব্যাপারে মুফাসসাল জারহ (তথা তার দোষত্রুটি বিস্তারিত বর্ণিত) থাকার পরও তার বিষয়ে তাদীল নিয়ে কাজ করা। যতক্ষণ না তাদীলকারীরা ইলমের ভিত্তিতে তার বিবরণ দেয় ও খণ্ডন করে।

❞

৪০.

এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

"

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, কোনো ব্যক্তির সাধারণ জারহ নিয়ে সমালোচনা করা যেখানে তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। যদি না জারহ মুফাসসাল হয় অথবা কোনো বড়ো ইমামের পক্ষ থেকে জারহ আসে।

"

৪১.

এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

"

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, বিদআতিদের দিকে ঝুঁকে পড়া এবং তাদের সঙ্গে অনর্থক আলাপে জড়িত হওয়া।

"

৪২.

"

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, কোনো বিষয়ে আরবি ভাষার রীতি ও সালাফগণের বুঝের বাইরে গিয়ে কুরআনের আয়াত ও হাদীসের ভাষ্যসমূহ দ্বারা অন্য কিছু প্রমাণ করা।

"

৪৩.

এটা সালাফগণের **মানহাজ নয়!**

“

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্ত ভাষ্য দিয়ে কথা বলা।[৪৮]

”

৪৪.

“

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, আকীদাহর ক্ষেত্রে প্রমাণ হিসেবে আহাদ (খবরে ওয়াহিদ) হাদীসকেও উপেক্ষা করা।[৪৯]

”

টীকা-৪৮

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ ﷺ বলতেন, যে দুনিয়াকে নষ্ট করেছে চার শ্রেণির লোক, অর্ধ বক্তা, যে নিজের কথা বিস্তারিত না বলার কারণে সমস্যা বেড়েছে। আকীদাহ ও দীন নষ্ট করেছে। অনুরূপ অর্ধ ফকীহ, যে ফিকহের মাসআলা ভালো করে আয়ত্ত না করে ফাতওয়া দিয়ে মানুষদের আমল নষ্ট করেছে। তদ্রূপ অর্ধ ভাষাবিদ সেও ভাষা রপ্ত না করার কারণে অনবরত ভুল করতে থাকে। অনুরূপভাবে অর্ধ ডাক্তার সে মানুষদের ডাক্তারি করতে গিয়ে তাদের শরীর বিনষ্ট করে দেয়। *[দেখুন, আল-ফাতাওয়া আল-হামাওয়িয়্যাহ আল-কুবরা, পৃ. ৫৫৪]*

সুতরাং যে ব্যক্তি কথা স্পষ্ট করেনি সে আকীদা ও দীন নষ্ট করে দেয়। অনেক সময় তারা মুজমাল শব্দ ব্যবহার করার কারণে আকীদায় মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করে। যেমন, জিসিম, হাইয়্যিয, কাদীম, হুদুস ইত্যাদি শব্দাবলি করে যুগ যুগ ধরে কালামশাস্ত্রবিদরা মানুষদের ধোঁকা দিয়েছে। অথচ বিস্তারিত জানলে দেখবেন যে এগুলো কাগুজে বাঘের মতো, বাস্তবে এগুলো অনাহুত ও বেহুদা কথা।

টীকা-৪৯

হাদীস বিশুদ্ধ হলে তা অবশ্যই আকীদাহ, শরীআহ, সুলুক সকল ক্ষেত্রে দলীল হবে। এটাই কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবায়ে কিরামের মত। এ ব্যাপারে কেবল বিদআতিরাই ভিন্নমত পোষণ করে। পথভ্রষ্টতার প্রথম সোপান হচ্ছে আকীদাহর জন্য সহীহ খবরে ওয়াহিদ গ্রহণ না করা।

মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীস বলতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা, কাজ, অনুমোদন, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, শারীরিক বৈশিষ্ট্য, সীরাত সবকিছুকে শামিল করে। এক কথায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যা কিছু এসেছে সবই হাদীস, সবই সুন্নাহ, আবার এগুলোকেই 'খবর' বলা হয়।

হাদীসের বর্ণনা সংখ্যার দিক দিয়ে দুভাবে বিভক্ত করা হয়। মুতাওয়াতির ও আহাদ।

মুতাওয়াতির হচ্ছে এমন হাদীস যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এত বেশি হবে যে, যাদের মিথ্যার ওপর একমত হওয়া অসম্ভব হবে যারা ধারণা করে না বলে জেনে বলেছে বলে হাদীসে স্পষ্ট করে বলবে যারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কিছুর ওপর নির্ভর করে হাদীসটি বলবে যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা সর্বদা সমপর্যায়ে থাকবে।

আর আহাদ বা খবরে ওয়াহিদ হচ্ছে এমন হাদীস যা উপরিউক্ত পর্যায়ে পৌঁছেনি কিন্তু তাদের মিথ্যার ওপর একমত হওয়া অসম্ভব।

বস্তুত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগ সাহাবায়ে কিরামের যুগে হাদীস, সুন্নাহ, খবর যা-ই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে বিশুদ্ধভাবে আসত, তাই নির্দ্বিধায় কোনো বাক্যব্যয় ব্যতীতই সকলে আমল করত। এ অবস্থা হিজরি প্রথম শতক পর্যন্ত চলে আসছিল, তারা কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসের ব্যাপারে ভিন্ন কোনো চিন্তা করত না। কতজন বর্ণনা করল সেটাও তখন বড়ো কথা ছিল না। বড়ো কথা ছিল নির্ভরযোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ লোকদের মাধ্যমে এলো কি না।

সর্বপ্রথম কাদরিয়া ও মুতাযিলা ফিরকার লোকেরা এ ব্যাপারে কথা বলতে আরম্ভ করে যে-কোনো হাদীস যদি মুতাওয়াতির পর্যায়ে না আসে তবে সেটি দিয়ে আকীদাহ ও আহকাম সাব্যস্ত হবে না। সর্বপ্রথম যার থেকে হাদীস গ্রহণের জন্য এ শর্তারোপ করার কথা বলা হয়, সে হচ্ছে ওয়াসিল ইবন আতা আল-মুতাযিলি।

আর তখনই ইমাম শাফিয়ি রহ. তাঁর 'রিসালাহ' গ্রন্থটি রচনা করেন তাদের সেসব দাবি খণ্ডন করার জন্য। তার সঙ্গে ইবরাহীম ইবন ইসমাঈল ইবন উলাইয়্যাহর সঙ্গে এ ব্যাপারে ব্যাপক মুনাযারা হয়েছিল, যাতে ইবরাহীম সবসময় পরাস্ত হয়েছিল। অনুরূপ সে সময় যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস গ্রহণের জন্য মুতাওয়াতির হওয়ার শর্তারোপ করেছিল তাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিল হাফস আল-ফারাদ, দিরার ইবন আমর। এরা সবাই মুতাযিলাদের দ্বারা দীক্ষিত ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসকে তার বর্ণনা পদ্ধতি কম বা বেশি হিসেবে মুতাওয়াতির ও আহাদ এভাবে ভাগ করা দোষের কিছু বলা যায় না। কারণ পরিভাষা সবসময়েই ছিল, যা পরবর্তীকালে মানুষ ব্যক্ত করেছে। যেমন: নাহুর নিয়মাবলি আরবি ভাষাতে সবসময়েই ছিল। কিন্তু আলি রা. বা আবুল আসওয়াদ আদ-দুয়ালি এগুলোকে ব্যক্ত করেছেন।

কিন্তু সমস্যা হয় তখনই যখন এসব সংজ্ঞা মূল বিষয়ে আঘাত হানে। মুহাদ্দিসগণ কখনো এসব সংজ্ঞাকে নিষিদ্ধ বলেননি। আবার তারা এগুলোর প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেননি। কারণ তাদের মানহাজে মুতাওয়াতির যেমন, আহাদও তেমন তারা দলীল বিশুদ্ধ হওয়া নিয়ে চিন্তা করে দলীলটি কতজনে বলল সেটা তাদের কাছে কখনো মুখ্য বিষয় ছিল না। এটি মুহাদ্দিসগণ অকপটে স্বীকার করেছেন।

এর অর্থ হচ্ছে, কোনো হাদীস যখন সহীহ প্রমাণিত হবে তখন সেটার সম্পর্কে বলা হবে 'তাজাওয়াযাল কানতারাহ' (সেতু পার হয়েছে) বা সকল বাধা অতিক্রম করে গেছে। মুহাদ্দিসগণের নিজস্ব নীতিতে হাদীসটি সহীহ হওয়ার পর মুতাওয়াতির কিংবা আহাদ হলো সেটা বড়ো কথা নয়। মুতাওয়াতির ও আহাদ ভাগ করা, আবার আহাদকে মাশহূর, আযীয ও গরীব। এ তিন ভাগ করা এটি মূলত উসূলে ফিকহের একটি বিষয়, যা পরবর্তী কোনো কোনো মুহাদ্দিস উসূলবিদদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বর্ণনা করে থাকবেন। পূর্বকালের মুহাদ্দিসগণ কখনো এটাকে সামান্যতম গুরুত্ব দেননি। এর প্রমাণ আমরা পাই 'ইন্নামাল আ'মালু বিন নিয়্যাতি' হাদীস দ্বারা ইমাম বুখারি কর্তৃক তার গ্রন্থের সুন্দর সূচনা করেছেন। এ হাদীসটি গরীব হাদীস। অর্থাৎ উসূলবিদদের ভাগ অনুযায়ী খবরে ওয়াহিদ এর সর্বনিম্ন পর্যায়ের। কিন্তু ইসলামি শরীআতের সকল অধ্যায়ে তার রয়েছে অপ্রতিরোধ্য প্রবেশাধিকার। বস্তুত হাদীস প্রসিদ্ধ হওয়া বা অপ্রসিদ্ধ হওয়া একটি আপেক্ষিক বিষয়।

বিস্তারিত দলীল জানার জন্য দেখুন, 'সহীহ হাদীস বিশ্বকোষ' প্রথম খণ্ডে আমার লেখা ভূমিকা।

৪৫.

এটা সালাফগণের
মানহাজ নয়!

“

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, শুধুই মুতাওয়াতির হাদীসের মধ্যেই (দীন বিষয়ক) জ্ঞানের বিবরণ বা রিওয়ায়াতকে সীমাবদ্ধ করা।

”

৪৬.

“

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, আদিল বা দীনের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত কারো বর্ণনা/তথ্য বাদ দেওয়া এবং গ্রহণ না করা।

”

৪৭.

এটা সালাফগণের
মানহাজ নয়!

“

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, বিতর্ক ও মতবিরোধে লিপ্ত হওয়া বরং তাঁরা (সালাফগণ) কুরআন ও সুন্নাহকে বোঝার জন্য তাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন, সে (কুরআন ও সুন্নাহ) অনুযায়ী আমল করেছেন এবং এর দিকেই আহ্বান করেছেন।

”

৪৮.

“

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, সাহাবিগণ যার ওপর ছিলেন, সেটার অনুসরণ ত্যাগ করা এবং এমন সব অর্থ প্রবর্তন করা যা দীনের পরিপন্থি।

”

৪৯.

এটা সালাফগণের
মানহাজ নয়!

“এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, নিজেকে এমন বিষয়ে ব্যস্ত রাখা যা আখিরাতে কোনো কল্যাণে আসবে না।”

৫০.

“এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, কোনো বিষয়ে আলিমদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে তর্ক করা। শিক্ষার্থী জানে যে, সে একজন শিক্ষার্থী এবং এসব নাওয়াযিল ও গুরুতর বিষয় অনুসন্ধান করা আলিমদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।”

৫১.

এটা সালাফগণের
মানহাজ নয়!

“এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, প্রত্যেক তালিবুল ইলমদের আল-জারহ ওয়া তাদীল-এর (রাবিদের সমালোচনা ও প্রশংসা) জ্ঞানের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার সুযোগ দেওয়া, যেহেতু প্রতিটি শাস্ত্রের নিজস্ব আলিম রয়েছে এবং যেমন জ্ঞান সবার কাছ থেকে নেওয়া হয় না, সুতরাং এটা সবার জন্য উচিতও নয় যে আল-জারহ ওয়া তাদীল-এর বিষয়ে কথা বলা।”

৫২.

এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

“

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, ছাত্রকে কুরআন ও হাদীসের পূর্বে অন্য কিছু [মতবাদ, দর্শন] দ্বারা আচ্ছন্ন করা। সুতরাং যদি সে বুঝশক্তি অর্জন করে এবং তার দীন থেকে তার যা প্রয়োজন তা শিখে তারপরে সে যা চায় তার অনুসন্ধান করুক।।

”

৫৩.

এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

“

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, একজনের মতামতের অনুসরণ করে ফাতওয়া ও রায় দেওয়া।[৫০] বরং সালাফগণের আদর্শ ছিল কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করা। সুতরাং তারা ফাতওয়া প্রদানে সাধ্যানুযায়ী কুরআনের আয়াত বা হাদীস বাদ দিতেন না।।

”

টীকা-৫০

এটার নাম তাকলীদে শাখসি বা একক ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ। তাকলীদ সম্পর্কে আমরা ইতঃপূর্বে [মানহাজ নং-১০] আলোচনা করেছি। এখানে শুধু তাকলীদে শাখসি নিয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই।

❑ **বস্তুত মানুষ তিন প্রকার:**

এক. মুজতাহিদ: তিনি হচ্ছেন ঐ ব্যক্তি যিনি কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্য থেকে সরাসরি মাসআলার বিধান বের করতে সক্ষম। এমন ব্যক্তির জন্য কর্তব্য হচ্ছে তার ইজতিহাদ তাকে যেখানে পৌঁছাতে পেরেছে সেটা অনুযায়ী চলবে। তার জন্য তাকলীদ করা হারাম। এ ধরনের মুজতাহিদের আবার শ্রেণিবিভাগ হতে পারে। সকল অধ্যায়ে মুজতাহিদ না হলেও যেখানে তার পর্যাপ্ত জ্ঞান রয়েছে সেখানে তিনি ইজতিহাদ করে আমল করতে পারবেন।

দুই. তালিবুল ইলম বা ছাত্র: এমন ছাত্র যার কাছে আলিমগণের দেওয়া মতামতের প্রদত্ত দলীলের মাঝে প্রাধান্য দেওয়ার সক্ষমতা আছে, যদিও তিনি ইজতিহাদের পর্যায়ে পৌঁছাননি। এমতাবস্থায় তার জন্য কোনো আলিমের তাকলীদ করার বাধ্যবাধকতা নেই। বরং তিনি আলিমগণের বক্তব্য, তাদের দলীলের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করে যা তার কাছে প্রাধান্য পায় তার ওপর আমল করবেন।

তিন. সাধারণ মানুষ: যার কাছে ইজতিহাদ করার ক্ষমতা নেই, আর তার কাছে শরীআতের এমন কোনো জ্ঞানও নেই যা দ্বারা সে আলিমগণের মতামতের মধ্যে প্রাধান্য দিতে পারবেন। এমতাবস্থায় তার জন্য বাধ্যতামূলক হচ্ছে আলিমগণকে জিজ্ঞেস করা। তিনি আলিমগণের দেওয়া মতামতের ওপর আমল করবেন। কারণ আল্লাহ বলেন,

> "যদি তোমরা না জানো তবে যারা আহলুয যিকর (কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে অভিজ্ঞ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করো।" *[সূরা আন-নাহল: ৪৩]*

এমতাবস্থায় উক্ত সাধারণ মানুষ যার কথাকে তার কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয় তার দেওয়া ফাতওয়া অনুযায়ী আমল করবেন।

৫৪. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

"

এটা সালাফগণের মানহাজ নয় যে, বিদআতিদের ভালোবাসা বা তাদের প্রতি সু-ধারণা রাখা। সালাফগণ তাদের সুন্দর কথায় বা বাকপটুতার ধোঁকায় পতিত হননি। বরং তাঁরা জানতেন যে, হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, "কোনো ব্যক্তি যাকে ভালোবাসবে আখিরাতে তার সঙ্গেই থাকবে।"[৫১]

"

৫১. বুখারি, আল-জামিউস সহীহ, হা. ৬১৬৮; মুসলিম, আস-সহীহ, হা. ২৬৪০। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে [মানহাজ নং-১৪ ও ৩২ এ] করা হয়েছে।

এ গ্রন্থের ওপর টীকা ও ব্যাখ্যা এখানেই শেষ হলো।
আলহামদুলিল্লাহ

রাত ২.৩৬ , ০৬/০৭/২০২১

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

“...আমার পরে অচিরেই তোমরা মারাত্মক মতভেদ লক্ষ্য করবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাত ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের পন্থা অবশ্যই অবলম্বন করবে, তা দাঁত দিয়ে শক্তভাবে কামড়ে ধরবে।...”

[ইবন মাজাহ, আস-সুনান, হা.৪২]

Believers Vision
believersvision.com